বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ
২০২১

বাংলা
বিভাগীয়
পত্রিকা

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা
ষোড়শ বর্ষ, ষোড়শ সংখ্যা
জুন, ২০২১

মুখ্য সম্পাদক
ড. অদিতি দে (অধ্যক্ষ)

সম্পাদক
ড. শর্মিলা ঘোষ (বিভাগীয় প্রধান)

সহকারী সম্পাদক
ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি
ড. শ্রাবন্তী মিত্র
দিশারী মুখার্জি

প্রকাশক
বাংলা বিভাগ
শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ
১১, লর্ড সিন্‌হা রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৭১

মুদ্রক
প্রতিরূপ
৩৫, নন্দনা পার্ক
কলকাতা - ৭০০ ০৩৪

বিষয় সূচি

		পৃষ্ঠা
ছড়ার কথা **ড. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত,** সহযোগী অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, আশুতোষ কলেজ	—	১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ **ড. পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়,** সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যোগমায়াদেবী কলেজ	—	৪
শেষ অঘ্রান **ড. রুণা চট্টোপাধ্যায়,** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হরিমোহন ঘোষ কলেজ	—	৭
আন্তর্জালিক আন্তর্কলেজ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা (অগষ্ট, ২০২০)		
■ **প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ** **অনলাইন পড়াশোনা ঃ সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা** **সুকন্যা ভদ্র,** ভূগোল বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ	—	৮
■ **দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ** **অনলাইন পড়াশোনার সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা** **সৌমি বসু,** সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ	—	১১
■ **তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ** **করোনা পরবর্তী বিশ্ব** **সৈরন্ধ্রী দে,** প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, বেহালা কলেজ	—	১৩
মৃত্যু ● **সুদীপ্তা সাহা,** প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ	—	১৬
পৃথিবী যদি ধ্বংস হয় ● **শ্রেয়সী দে,** প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ	—	১৭
বৃষ্টি ● **অনুষ্কা নন্দী,** ষষ্ঠ সেমিস্টার, ইংরেজি বিভাগ	—	১৮
বিভাগীয় নানা কিছু	—	১৯
ছবি ● **ঐন্দ্রিলা দাস,** ষষ্ঠ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ	—	২২

পৃষ্ঠা

প্রতিচ্ছবি ঃ বিপাশা হাওলাদার, ষষ্ঠ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ — ২৩

বাংলার লোকনৃত্য ● নাজিমা খাতুন, ষষ্ঠ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ — ২৫

চিঠি ● সৃজিতা চক্রবর্তী, ষষ্ঠ সেমিস্টার, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ — ২৮

বোধন ● সমাদৃতা ঘোষ, চতুর্থ সেমিস্টার, ইংরেজি বিভাগ — ২৯

"পাহাড়ের রানী দার্জিলিং থেকে পাইনে মোড়া লামাহাটা" — এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা — ৩০
রিয়াঙ্কা ব্যানার্জী, দ্বিতীয় সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

ধুলো ● সমৃদ্ধা ঘোষ, চতুর্থ সেমিস্টার, ইংরেজি বিভাগ — ৩২

দেবীর বেদি ● সমৃদ্ধা ঘোষ, চতুর্থ সেমিস্টার, ইংরেজি বিভাগ — ৩৩

বিদ্যাসাগর ঃ দ্বিশতবর্ষ অতিক্রমকারী এক বিরল ব্যাক্তিত্ব — ৩৪
রিয়াঙ্কা ব্যানার্জী, দ্বিতীয় সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

ফেলুদার সঙ্গে বোলপুরে — ৩৭
দেবলীনা দাশগুপ্ত, প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

প্রিয় কথক — সদত হসন মান্টো — ৪০
দিশারী মুখার্জী, অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

পঞ্চাশেও প্রাসঙ্গিক ঃ অপ্রতিদ্বন্দ্বিত প্রতিদ্বন্দ্বী — ৪২
দেবলীনা গুহ ঠাকুরতা, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

বিভাগের কথা — ৪৫

আমাদের কথা

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যা (২০২১) প্রকাশিত হল। এবারের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ পৃথক। অতিমারির এই সংকটকালে পত্রিকা প্রকাশিত হল অন্তর্জালে। এই 'প্রথম' এবং আশা করি এই 'শেষ'। এ এক নতুন 'চ্যালেঞ্জ' সন্দেহ নেই। 'বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো' একে অপরের থেকে দূরে থেকে কাজটা করা যথেষ্ট কঠিন। তবে এই কঠিন কাজটাই শেষপর্যন্ত সম্ভব হয়েছে সকলের সহযোগিতায়। কলেজের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রীরা নানা বিষয়ে তাদের লেখা দিয়েছে। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো আন্তর্কলেজ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার নির্বাচিত প্রথম তিনটি লেখা প্রকাশ করেছি আমরা। আর অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমরা এবার বেশ কয়েকটি আমন্ত্রিত লেখা পেয়েছি। অধ্যাপক ড. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ড. পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ড. রুণা চট্টোপাধ্যায় তিনটি মূল্যবান লেখা দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমাদের কলেজের অধ্যাপক দেবলীনা গুহ ঠাকুরতা একটি প্রাসঙ্গিক লেখা দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী, বর্তমানে সহকর্মী দিশারী মুখার্জী একটি লেখা দিয়েছেন। তাঁর প্রতি রইল শুভকামনা। বাংলা বিভাগের তিনজন প্রাক্তনী লেখা পাঠিয়েছে। তাদের শুভাশিস জানাই ।

বিভাগের সারা বছরের কাজকর্মের খতিয়ান রয়েছে পত্রিকার শেষে 'বিভাগের কথায়'। আর রইল বিভাগের নানা অনুষ্ঠানের কিছু ছবি।

আমাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যাবে নিশ্চিত। তার জন্য আগাম ক্ষমাপ্রার্থী। আমাদের আয়োজন খুব বেশী নয়, কিন্তু সৎ আমাদের প্রচেষ্টা। আর সেটুকুই আমাদের পাথেয়।

সামনের বছরগুলিতে আরও ভাল করে পত্রিকা প্রকাশের অঙ্গীকার রইল।

ছড়ার কথা

ড. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, সহযোগী অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, আশুতোষ কলেজ

(১)

লোকসাহিত্যের জনপ্রিয়তম প্রকরণ হল ছড়া, সম্ভবত প্রাচীনতমও। সভ্যতার গোড়ার দিকে প্রাচীন মানুষরা দেবতাদের বিচিত্র অস্তিত্ব কল্পনা করে তাদের উদ্দেশে ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে যে সব স্তবস্তুতি নিবেদন করতো — সেই সবই হল ছড়ার আদি উৎস। অর্থাৎ আদিম মন্ত্রগুলোর বাণীই কালের বিবর্তনে ছড়ায় পরিণত হয়েছে এবং কালক্রমে অন্তর্লীন ধর্মবিশ্বাসের অনুষঙ্গটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে যে মাধ্যমের দ্বারা পারিবারিক বা সামাজিক অনুভূতি প্রকাশিত হয়, তাকেই ছড়া বলা হয়ে থাকে। তাতে সুর থাকেনা কিন্তু ছন্দ থাকে। তাই লোকসাহিত্যে ছড়াকে ''The Poetic Primitive'' (আদিম কবিতা) বলা হয়ে থাকে।

ছড়া প্রধানত দু ধরণের ঃ

১। সাহিত্যিক ছড়া

২। লৌকিক ছড়া

১. সাহিত্যিক ছড়া তৈরি হয় মূলতঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে। কিন্তু তাহলেও সেগুলির মধ্যেও মনের অকপট প্রকাশ ঘটে। আমাদের মনে পড়বে অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই বিখ্যাত ছড়াঃ ''তেলের শিশি ভাঙলে পরে খুকুর ওপর রাগ করো / তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো, তার বেলা?''.... বস্তুতঃ দেশের স্বাধীনতার সময় দুটুকরো হওয়া ভূখণ্ড যে বহু মানুষকে বিপর্যস্ত করেছিল, সেই বেদনাময় স্মৃতির ছবিই সরাসরি এই ছড়াটিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

২. তবে সাহিত্যিক ছড়ার থেকে অনেক বেশি জনপ্রিয় হল লৌকিক ছড়া। সেই ছড়ার একাধিক ভাগ আছে, যেমন ঃ

ক) ছেলেভুলানো ছড়া

খ) সর্বজনীন ছড়া

গ) খেলার ছড়া

ঘ) ঐন্দ্রজালিক ছড়া

আবার ব্রতকথাকেও একাধারে লোককথা ও ছড়ার মিশ্রণ বলা যায় কারণ তাতে ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি কাহিনি, সুর, ছন্দ সবই থাকে। আর থাকে সামাজিক একটি চেহারাও, কারণ সাধারণত ব্রতকথা একজন পড়ে, অন্যেরা শোনে। পাশাপাশি ধাঁধাঁ ও প্রবাদের মধ্যেও ছড়ার মতো ছন্দ থাকে।

তাহলে অনিবার্য যে প্রশ্নটি উঠে আসে সেটি হল খাঁটি ছড়া কোনগুলোকে বলা যায়? খাঁটি ছড়া হল সেগুলিই যার মধ্যে —

- ধর্ম কিংবা আচার-সংস্কারের অভিক্ষেপ থাকবে না
- আপাত-অসংলগ্নতা থাকবে।
- ছন্দোস্পন্দন থাকবে।
- পরিচিত জগতের চিত্রই প্রধান উপজীব্য হবে।

ফলে ঐন্দ্রজালিক ছড়া কিংবা ব্রতের ছড়াকে খাঁটি ছড়া বলে নাও ভাবা যেতে পারে কারণ এগুলিতে অলৌকিকতা ও আধিদৈবিকতা থাকে । কিন্তু তার সঙ্গেই থাকে যথাক্রমে ছড়ার মতো আপাত অসংলগ্নতা ও কাহিনি। অন্যদিকে ধাঁধা কিংবা প্রবাদের মধ্যে অসংলগ্নতা থাকেনা, বরং যুক্তিগ্রাহ্য ও ভাবগত সুসংলগ্নতা থাকে । কিন্তু ছড়ার আলোচনায় এদেরও পুরোপুরি বাদ দেওয়াও যায়না কারণ ছড়ার মতোই এতেও থাকে ছন্দোস্পন্দন আর পরিচিত পৃথিবীর ছবি।

(২)

এই পর্বে এবারে ক্রমান্বয়ে দেখে নেওয়া যাক লৌকিক ছড়ার নানান প্রকরণকে।

ক) প্রথমেই আসে ছেলেভুলানো ছড়ার কথা।

ছেলেভুলানো ছড়ায় সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষিতে মূলতঃ মা ও শিশুর শাশ্বত সম্পর্কের ছবি আসে। সেই নিরিখে এ জাতীয় ছড়ায় পাওয়া যায় মাতৃহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, উদ্বেগ, আকুলতা, যার মধ্যে অবাস্তব ও বস্তুজগৎ মিলেমিশে যায়। যেমন —

১. খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে ?
বাড়িতে আছে হুলো বেড়াল কোমড় বেঁধেছে। (পুত্রকে বর রূপে দেখার সাধ)

২. খোকন খোকন করে মায় / খোকন গেছে কাদের নায় ? / সাতটা কাকে দাঁড় বায় / খোকন রে তুই ঘরে আয়।
(পুত্রবিহনে মায়ের উদ্বেগ ও আকুলতা)

৩. হাট্টিমাটিম টিম / তারা মাঠে পাড়ে ডিম / তাদের খাড়া দুটো সিং / তারা হাট্টিমাটিম টিম।
(বাস্তব ও অবাস্তবের সহাবস্থান)

ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে ঘুমপাড়ানি গান তথা lullaby-কেও ধরা যেতে পারে, কারণ মা গানের সুরে ও ছন্দে সন্তানকে ঘুম পাড়ান। যেমন —

ঘুমুপাড়ানি মাসিপিসি মোদের ঘরে এসো / খাট নাই পালং নাই চোখের ওপর বোসো।

খ) সর্বজনীন ছড়া হল সেই ছড়া যা কিনা সবার জন্যে আর এই উপবর্গে অনেক সময়েই ছড়া কেটে ধাঁধা বলা হয়ে থাকে।

যেমনঃ বন থেকে বেরোলো টিয়ে / সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।

পূজাপার্বণ উপলক্ষে আওড়ানো ছড়াকেও সর্বজনীন ছড়া বলা হয় ।

যেমনঃ দালান ঘরে বসত করি / সতীন কেটে আলতা পরি (সেঁজুতি ব্রতের ছড়া)

গ) খেলার ছড়া মূলতঃ গ্রামীণ ক্রীড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও শহুরে বাতাবরণেও যেখানে community সুলভ পরিবেশ আছে, সেখানেও এই ছড়া ব্যবহৃত হয় ছোটদের খেলায়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারেঃ

১. কানামাছি ভোঁ ভোঁ / যাকে পাবি তাকে ছোঁ।... খেলুড়ে দলের একজনের চোখ বেঁধে দিয়ে সেই অবস্থায় তাকে অন্যদের খুঁজে বের করে স্পর্শ করতে হয়।

২. এলাটিং বেলাটিং সই লো / কিসের খবর আইল ?

রাজা একটি বালিকা চাইল। / কোন বালিকা চাইল ?... দুই দলের খেলায় অতঃপর একটি দলের এক খেলুড়ে, যাকে ''রাজা'' বেছে নেয়, সে দল থেকে বাদ হয়ে যায়।

সামাজিক নিরিখে দুটি খেলাতেই ক্ষমতাবানের হাতে মানুষের অসহায়তার যে কথা বর্ণিত হচ্ছে, তা আসলে শিশুক্রীড়ার ছদ্মবেশে সমাজই বাচ্চাদের মনে সঞ্চারিত করছে তাদের অজান্তেই।

ঘ) ঐন্দ্রজালিক ছড়াকে যে খাঁটি ছড়া বলা যায়না সে কথা আগেই বলা হয়েছে কারণ তাতে অলৌকিকতা থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই জাদুকররা মঞ্চে এসে chanting তথা মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে একটা অবাস্তব পরিবেশ তৈরি করেন মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এবং উচ্চারিত বেশির ভাগ শব্দেরই অর্থ থাকে না, অর্থাৎ আপাত অসংলগ্নতা যা কিনা ছড়ার একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন ঃ অ্যাবরাকাড্যাবরা গিলি গিলি গিলি হোকাস পোকাস ছুঃ

(৩)

খাঁটি ছড়া না হলেও ব্রতকথায় দেবদেবী ভিত্তিক কাহিনিকে ছন্দোময় ভাবে এমনকি সুর সহযোগেও পরিবেশন করা যায়। লক্ষ্মীর পাঁচালি, মেয়েলি নানা ব্রতের পূজা এর যোগ্য উদাহরণ।

ধাঁধাও তো খাঁটি ছড়া নয় কারণ এতে ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ভান্ডারের প্রয়োগে সুসংলগ্নভাবে বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়, কিন্তু তা হয় ছড়ার আকারেই।

যেমন ঃ আল্লার কি কুদরৎ / ঠ্যাঙার মধ্যে সরবত (আখ)

কিংবা

এক হাত গাছটি / ডাল তায় পাঁচটি (মানুষের পাঁচ আঙুল বিশিষ্ট হাত)

প্রবাদেও আমরা ছড়ার মতোই অন্ত্যমিল ও ছন্দ-যুক্ত কাহিনি পাই, যার মাধ্যমে কোনো জাতির মূল্যবোধ প্রকাশিত হয়। প্রবাদকে বলা হয় wisdom of many, wit of one, যা গড়ে ওঠে যৌথ সামাজিক মানসিকতা থেকে আর এতে অনেক সময়েই ধরা পড়ে নানা সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাস। ফলে কাহিনি এবং ছন্দ, তাতে দুইই থাকে।

উদাহরণ মনে পড়ে ঃ

ক) ভাল কথা মনে পড়ল আঁচাতে আঁচাতে
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেছে নাচাতে নাচাতে।
(ননদ-বৌদির তিক্ত সম্পর্কের নিদারুণ ছবি এসেছে ছড়ার ছন্দে)

খ) বড়োর পিরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দাড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ
(বড়লোকের খেয়ালের শ্লেষাত্মক ব্যাখ্যা)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ''লোকসাহিত্য'' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

''এই-সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনোকালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন শকের কোন তারিখে কোনটা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারো মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।''... এই ''স্বাভাবিক চিরত্বগুণ''-ই হলো ছড়ার প্রাণবস্তু যে কারণে কখনো মায়ের হৃদয়, কখনো সামাজিক অপহ্নব, কখনো বা নিছক আমোদ ইত্যাদি নানা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে ছড়ার সব প্রকরণই হয়ে উঠেছে খুবই আকর্ষণীয়। তাই খাঁটি হোক বা না হোক, ছড়া আজো লোকসাহিত্যের জনপ্রিয়তম বর্গ যে তা নিয়ে সত্যিই সন্দেহের অবকাশ থাকেনা। ■

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

ড. পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যোগমায়াদেবী কলেজ

পলাশীর প্রান্তরে সিরাজের ভাগ্য বিপর্যয়ের পরবর্তী ৫০ বছরে বণিক ইংরেজ ছলে-বলে-কৌশলে বাংলা তথা ভারতের শাসক হয়ে উঠলো । শাসক ইংরেজের প্রবলতর শক্তির প্রভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা, ভাব ও সংস্কৃতি বাঙালির জীবনে ও মননে তীব্র অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল । তার অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় পরিণাম ই দেশ ও জাতিকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে তুলেছিল । মধ্যযুগীয় চিন্তা-ভাবনা ও সমাজ ব্যবস্থার অচলায়তনে আবদ্ধ বাঙালির শ্লথগতি জীবনযাত্রা সহসা নবচেতনার বেগে বলীয়ান হয়ে উঠল । বাঙালি উদ্যমে ও জীবনবোধে মধ্যযুগ অতিক্রম করে নবযুগের অংশীদার হল । ১৯ শতক বাঙালির নবজাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ। এই নবজাগরণের একটি গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্য আছে। সেই গভীরতা ও ব্যাপকতার উৎস থেকে তৎকালীন সাহিত্য প্রচেষ্টা উৎসারিত । শুধুমাত্র একটি নবসাহিত্য রচনার উদ্যমই নবজাগরণের পরিপূর্ণ রূপ নয়। রাষ্ট্রজীবন, সমাজজীবন, ধর্ম, সংস্কৃতি , শিল্প, শিক্ষা, সভ্যতা — এক কথায় সমগ্র জীবন সাধনার সমন্বয় ও ঐক্যের মধ্যেই বিধৃত ও স্পন্দিত হয় নবজাগরণের চিৎশক্তি। এই ইতিহাস ধারার সন্ধান না করলে নবজাগরণের মর্মবাণীকে অনুভব করা সম্ভব নয়।

এই নবজাগ্রত বঙ্গদেশে ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে ।(বীরসিংহ তখন সম্ভবত হুগলি জেলার অন্তর্গত ছিল)। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতী দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র অল্প বয়সেই তাঁর বাবার সঙ্গে কলকাতায় চলে এসেছিলেন শিক্ষালাভের জন্য। শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ ক'রে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পন্ডিত হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও, ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন ঈশ্বরচন্দ্র। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৩০ বছর বয়সে ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন তিনি । সমাজসংস্কারক ও শিক্ষাবিদ্ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা এবং শিশু পাঠ্যবই রচনার পাশাপাশি যে সংস্কৃত হিন্দি ও ইংরেজি থেকে বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন, তার মূলে ছিল নব জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালির জাগ্রত চিত্তের জিজ্ঞাসা ।

জীবন ও জগৎ-কে নূতন চেতনার আলোকে দেখার আগ্রহ থেকেই অনুবাদ সাহিত্যের সূচনা হয় উনিশ শতকে। অনুবাদের মাধ্যমে শুধু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়াই নয়, স্বদেশের প্রাচীন শাস্ত্র ও রসসাহিত্যের অনুধাবন ও আস্বাদনের সুযোগও বাঙালি পাঠক পেল।

উনিশ শতকের অনুবাদ ধারার অচ্ছেদ্য অংশরূপে বিদ্যাসাগরের অনুবাদ গ্রন্থ রাজিকে তালিকাবদ্ধ করলে দেখা যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রসশাস্ত্র উভয় বিষয়ে তাঁর দক্ষতা অতুলনীয় —

প্রকাশকাল	গ্রন্থের নাম	মূল ভাষা
১৮৪৭	বেতাল পঞ্চবিংশতি	হিন্দি
১৮৪৮	বাঙ্গালার ইতিহাস	ইংরেজি
১৮৪৯	জীবনচরিত	ইংরেজি

প্রকাশকাল	গ্রন্থের নাম	মূল ভাষা
১৮৫১	বোধোদয়	ইংরেজি
১৮৫৪	শকুন্তলা	সংস্কৃত (কালিদাস)
১৮৫৬	কথামালা	ইংরেজি
১৮৫৬	চরিতাবলী	ইংরেজি
১৮৬০	সীতার বনবাস	সংস্কৃত (ভবভূতি)
১৮৬০	মহাভারতের উপক্রমণিকা	সংস্কৃত
১৮৬৯	ভ্রান্তিবিলাস	ইংরেজি* (শেক্সপিয়ার)

এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় হ'লো মহাকবি কালিদাসের ''অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'' নাটকের বিদ্যাসাগর প্রণীত গদ্যানুবাদ।

বিদ্যাসাগরের কোন অনুবাদই হুবহু পরানুসরণ নয়, আলোচ্য শকুন্তলা নাটকের গদ্য অনুবাদ এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সাত অঙ্কে বিন্যস্ত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ এর গৌড়ীয় সংস্করণ ও উত্তর ভারতীয় সংস্করণ এর পাঠ অনুসরণ করে বিদ্যাসাগর মহাশয় সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত গদ্য উপাখ্যান ''শকুন্তলা'' রচনা করেছিলেন।

মূল নাটক অনুযায়ী মহারাজ দুষ্মন্তের মৃগয়া প্রসঙ্গের উল্লেখ করেই গদ্য কাহিনীর সূচনা হয়েছে। প্রতিটি চরিত্রের সংলাপ অনূদিত হয়েছে বাংলা গদ্যে। অবশ্য সংলাপ উদ্ধৃতি চিহ্নের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। উত্তর ভারতীয় তথা দেবনাগরী সংস্করণের তুলনায় গৌড়ীয় সংস্করণে তৃতীয় অঙ্ক দীর্ঘতর। বিদ্যাসাগর মহাশয়-এর গদ্যানুবাদেও গৌড়ীয় সংস্করণের এই অতিরিক্ত অংশ সংযোজিত হয়েছে। যেমন মাধবীলতায় ফুল ফুটলেই শকুন্তলার বর আসবে এই উপাখ্যান গৌড়ীয় সংস্করণ থেকেই বিদ্যাসাগর গ্রহণ করেছেন। গদ্য কাহিনীর শেষাংশে মূল নাটকের সঙ্গে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। মূল নাটকের সপ্তম অংকে বর্ণিত হয়েছে, রাজা দুষ্মন্ত সর্বদমনের রক্ষাকবচ স্পর্শ করলেও তা সর্পে রূপান্তরিত হল না দেখে আশ্রমের তাপসীরা শকুন্তলাকে সংবাদ দিলেন। শকুন্তলা আপন সৌভাগ্য সম্পর্কে আশান্বিত না হয়েই অকুস্থলে এসে স্বামী দুষ্মন্তের দেখা পেলেন। অথচ বিদ্যাসাগরের অনুবাদের সপ্তম পরিচ্ছেদ-এর শেষাংশে মূল নাটকে বর্ণিত মারীচ আশ্রমের অন্যান্য ঘটনা উল্লেখিত হলেও অপরাজিতা কবচের প্রসঙ্গ বর্জিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর বর্ণনা করেছেন, বহুক্ষণ অদর্শনের ফলে উৎকণ্ঠিতা শকুন্তলা পুত্রকে অন্বেষণ করতে করতে হঠাৎ দুষ্মন্তের দেখা পেয়েছিলেন।

প্রয়োজন বুঝে মূল বক্তব্য থেকে বিচ্যুত না হয়েও সংলাপের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন বিদ্যাসাগর। যেমন,

মূল নাটকের তৃতীয় অংকের শেষাংশে কণ্ব মুনির ভগিনী গৌতমী বিরহ কাতর শকুন্তলাকে অসুস্থ মনে ক'রে তার কুশল কামনা করছেন, এই প্রসঙ্গটি বিদ্যাসাগর অসামান্য দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন।

মূল নাটকের সংলাপ এর বঙ্গার্থ এইরকম ঃ

''(জলের পাত্র নিয়ে গৌতমীর প্রবেশ, সঙ্গে দুই সখী)

গৌতমী ঃ বৎসে, তোমার শরীরে তাপ কিছু কমেছে কি ?

শকুন্তলা ঃ আজ একটু ভালো মনে হচ্ছে।

গৌতমী ঃ এই কুশোদকে তোমার সব অসুখের শান্তি হবে। বৎসে, দিন শেষ হয়ে এসেছে। চল, আমরা কুটীরে ফিরে যাই।

বিদ্যাসাগর কৃত গদ্য অনুবাদঃ

''কিয়ৎক্ষণ পরেই শান্তি জলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া গৌতমী লতা মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং শকুন্তলার শরীরে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা ! শুনিলাম আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল, এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে ? শকুন্তলা কহিলেন, হ্যাঁ পিসি! আজ বড় অসুখ হয়েছিল, এখন অনেক ভালো আছি। তখন গৌতমী কমন্ডলু হইতে শান্তিজল লইয়া, শকুন্তলার সর্ব্ব শরীরে সেচন করিয়া কহিলেন, বাছা ! সুস্থ শরীরে চিরজীবিনী হয়ে থাক। অনন্তর, লতা মণ্ডপে, অনসূয়া অথবা প্রিয়ংবদা, কাহাকেও সন্নিহিত না দেখিয়া, কহিলেন, এ অসুখে তুমি একলা আছ, কেউ কাছে নাই। শকুন্তলা কহিলেন, না পিসি ! আমি একলা ছিলাম না অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকটে ছিল, এইমাত্র মালিনীতে জল আনিতে গেল। তখন গৌতমী কহিলেন, বাছা ! আর রোদ নাই ! অপরাহ্ন হয়েছে, এস কুটীরে যাই''

গার্হস্থ্য জীবন রসসিক্ত এই কথোপকথন যথেষ্ট বাস্তবানুগ মনে হয়েছে বাঙালি পাঠকের কাছে । অনুবাদকের পর্যবেক্ষণশক্তি ও জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার পরিচয় মেলে অনুবাদ-এর বিভিন্ন অংশে, উদ্ধৃতাংশটি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

আলোচ্য অংশে আর একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটিয়েছেন অনুবাদক। মূল শ্লোকে গৌতমী বলেছেন, দিন শেষ হয়ে এসেছে, সন্ধ্যা আসন্ন, তাই তিনি শকুন্তলাকে একাকিনী না রেখে কুটিরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। বিদ্যাসাগরের অনুবাদে গৌতমী বলেছেন, আর রোদ নেই তাই এখন কুটিরে ফিরে গেলে শকুন্তলার আর কোন কষ্ট হবে না।

নাট্যগুণ বজায় রেখে এমন সুন্দর সরল অনুবাদ সৃষ্টি করা যে সম্ভব তা বিদ্যাসাগর প্রমাণ করে গেছেন। বাংলা ভাষা শৈলীকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন বিদ্যাসাগর এই অনুবাদের মাধ্যমে । বাংলা গদ্যের যথার্থ পদবিন্যাস রীতির (syntax) তিনিই নির্মাতা। সংস্কৃত পদান্বয় পদ্ধতির অনুসারী এক বিচিত্র পদবিন্যাস বাংলা গদ্যের বিকাশকে ব্যাহত করছিল, বিদ্যাসাগরের প্রতিভা স্পর্শে বাংলা গদ্য তার নিজস্ব গতিপথের সন্ধান পেল।

১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্স অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর ইংরেজি অনুবাদ করেন, শিরোনাম, ''The Fatal Ring''। এই ইংরেজি গদ্যানুবাদের জার্মান অনুবাদ পড়ে মহাকবি গ্যেটে ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে মন্তব্য করেছিলেন,

''Willst du den Himmel, die Erde, mit einem, Namen begriefen, / Nenn'ich Sakontala dich, und so ist alles gesagt''.

''একটি নামে যদি স্বর্গ আর মর্ত্যকে মেশাতে চান তাহলে, শকুন্তলা আমি তোমারই, নাম করছি আর তাহলেই সব কথা বলা হয়ে যায় ।''

একই ভাবনার প্রতিধ্বনি শোনা যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনায় —

১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে কালিদাসের নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ''কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ অপূর্ব্ব পদার্থ। .....মনুষ্যের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না।..... যদি শত বার পাঠ কর শত বারই অপূর্ব্ব বোধ হইবে।''

সংস্কৃত অনভিজ্ঞ অথচ রসজ্ঞ পাঠকদের সামনে অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের অনাস্বাদিত পূর্ব রসের আধারকে উপস্থিত করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের দ্বিশতবর্ষপূর্তিতে এই মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলাম।

শেষ অঘ্রান

ড. রুণা চট্টোপাধ্যায়, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হরিমোহন ঘোষ কলেজ

শেষ অঘ্রানকে মনে রাখে
কোনো কোনো অভিমানী গাছ
রাত ভর হিম যাকে ছুঁয়ে যায়
আশিকড়, প্রত্যন্ত পাতায়,
সেই তো জেনেছে স্নান, প্রকৃত জুড়ন
প্রস্তুত থেকো মন
শিশিরস্নান না জেনে,
এ পর্যন্ত প্রাপ্ত মরুদিন ভবিতব্য মেনে
চলে যাওয়া চাই।
মাঝে মাঝে মনে হয় আসন্ন সময়
পথ ডাকে, গৃহটান কোথায় যে যায় !
একদিন শেষ অঘ্রানে এখানে কেয়াঝোপে
দেখেছি, বর্ণময় সাপটি একা
তখনো শীতঘুম আসেনি বলে অবেলায়
পড়ন্ত আলোটি ছুঁয়ে কী মায়ায়
অপেক্ষায় থেকেছে ভারী নিজস্ব ধরণে
এইখানে, এই শেষ অঘ্রানে
আমিও খুব বিস্তৃত হয়ে থাকি স্বজনপ্রান্তরে।
যা কিছু হারিয়ে ফেলেছি এযাবৎ
মনকেমন করে।

শ্রী শিক্ষায়তন কলেজের বাংলা বিভাগ আয়োজিত আন্তর্কলেজ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় (২০২০) প্রথম স্থানাধিকারী রচনা

অনলাইন পড়াশোনা ঃ সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

সুকন্যা ভদ্র, ভূগোল বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ

প্রথমেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জটিল অঙ্কে না গিয়ে একটা গল্প সেরে নেওয়া যাক। আর 'জ্ঞানের চেয়ে অগ্রগণ্য কল্পনা' স্বয়ং বিজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ আইনস্টাইন বলে গেছেন, অতএব ...।

এক ক্লাসরুম ভর্তি ছেলেমেয়ে মেজাজে ক্যালরব্যালর করছে। স্যার এলেন। মাছের বাজার শান্ত; মুখে একেবারে কুলুপ বললেও ভুল হবে না। জায়গায় বসতে বসতে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিলেন স্যার, বললেন, — ''কি, সব এসেছো তো?''

এক ছাত্রী উঠে মুখের কুলুপটা খুলে জানান দিলো যে, তারা সবাই উপস্থিত, এবং পরক্ষণেই সেটা মুখে এঁটে বসে পড়ল নিজের জায়গায়।

''বেশ, তবে শুরু করা যাক। আজ আমরা পড়বো...''ক্লাস শুরু হল।

মুখবন্ধ শেষ করে এবার স্যার পাত সংস্থান তত্ত্বের গূঢ় আলোচনায় ঢুকলেন। বেশ চলছিল। এমন সময় হঠাৎ-ই সব ফ্যালফ্যাল করে দেখতে লাগল — চেয়ার ঘুরিয়ে উল্টো মুখো হয়ে পড়াতে লেগেছেন স্যার —

''ভালোভাবে দেখো, আমার এই হাতটা ইউরেশীয় পাত, আর এই এটা ইন্দো-অস্ট্রেলিয়, এইভাবে এরা একে অপরের ওপর চড়ে বসেছে...''

''স্যার''

''বলো''

এক ছাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে। ''স্যার আপনার ফোনের ব্যাক ক্যামেরা অন হয়ে গেছে বোধ হয়, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না''

অপ্রস্তুত স্যার বেশ খানিকক্ষণ চেষ্টা-চরিত্তির করে অবশেষে চেয়ার নিয়ে ঘুরে বসলেন। ছাত্রছাত্রীরা যে যার মত মুখে কুলুপ লাগিয়ে আবার ক্লাস শুনতে লাগলো।

এবার ঘর বেশ গমগমে হয়ে উঠেছিল। প্রথম বেঞ্চির প্রত্যেকেই প্রায় স্যারের সাথে প্রশ্নোত্তর আদান প্রদানে ব্যস্ত। তাল কেটে দিল শেষ বেঞ্চির এক মেয়ে। আবার। বলা নেই কওয়া নেই দুম করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যায়, আবার হুস করে ঢুকে আসে, আবার বেরিয়ে যায়।

''নেটওয়ার্ক প্রবলেম'' একজন অভিযোগ জানালো, বাকিরা চুপ। তবে হারাধনের যে একটিই ছেলে তা তো নয়।

সারা ক্লাসে নয় নয় করে দশজন বেরিয়ে গেল এভাবে। ফেরৎ এল বটে দুই তবে শেষের মুখে। স্যারের ঝোড়ো ডিকটেশন স্টাইল, টেস্ট ওপেনারের মত নিস্তেজ আজকাল। কিন্তু, স্যার গান গাইছেন যে! পেনগুলোর দুলুনি আচমকা স্থির। সুরেলা গলায় একেকটা অক্ষর বলছেন হাত নেড়ে। গানই যেন। ছাত্রছাত্রীরা উঠে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছে, হাত নাড়ছে — ''স্যার বুঝতে পারছি না'', ''শুনতে পাচ্ছি না স্যার''।

অমনি, কি হল, একশ্বাসে সব বকেয়া নোট ঝরঝর করে বলে গিয়ে এক ছুটে ক্লাসরুম ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন স্যার!

ক্লাস মুলতুবি।

আনন্দনাড়ুর মত মুখ করে কেটে পড়ল সিংহভাগ।

এখানেই গল্পের শেষ ও বাস্তবের শুরু। ব্যাপারটা 'হ য ব র ল'-এর স্মৃতি উসকে দিলেও, কমবেশি সব কলেজের, সব ফাঁকা ক্লাসরুমেই, এটা এখন ভার্চুয়াল চিত্র। ইতিমধ্যে যান্ত্রিক গোলযোগ, ধারাবাহিক ইন্টারনেট সংযোগের অভাব ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্পষ্ট হয়ে উঠছে সব স্তরেই। প্রবীণ শিক্ষক শিক্ষিকারাও বিশেষ সড়গড় নন 'এসব' ব্যাপারে, তবু চেষ্টা করছেন সাধ্যমত। অথচ যান্ত্রিক কারিকুরি যাদের রপ্ত, তাঁরা অভাবের গল্প শুনিয়ে ক্লাস নিচ্ছেন না। শিক্ষাক্ষেত্রে অনৈতিকতার এসব উদাহরণ পর্দার সামনে এখনো আসেনি, তাই বিশেষ গভীরে না যাওয়াই শ্রেয়। তবু সংশয়, অপ্রাপ্তি, বঞ্চনা, যান্ত্রিক ত্রুটি ইত্যাদি বহু বিবিধ সমস্যা কাটিয়ে শহুরে সরকারি বেসরকারি স্কুল কলেজগুলিতে প্রায় অর্ধবর্ষ হতে চলল শুরু হয়েছে অনলাইন ক্লাস। 'যেমনই চলুক কিছু পড়াশোনা তো হচ্ছে' — মত অভিভাবকদের। হক কথা বটে। গ্রাম প্রধান ভারতবর্ষের পাড়াগেঁয়ে ছেলেমেয়েরা সেটুকু থেকেও বঞ্চিত। কোথাও আলো নেই, কোথাও গ্যাস — সেখানে শিক্ষার গ্যাসবাতি তাদের ভাঙা ঘরে চলে আসবে — এটা অলীক। কত বাড়ির কাজ গেল লকডাউনে, করোনার থেকেও দ্রুত ছড়িয়েছে দারিদ্র্য। কত ছেলে পড়া ছেড়ে কাজ খুঁজছে, কত মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল — তার হিসাব হয়তো পরে পাওয়া যাবে, কিন্তু ততদিনে তাদের আর পাওয়া যাবে না। এই অন্ধকারে কিছুটা আলো জোগাচ্ছে সমাজের শুভানুধ্যায়ী স্বেচ্ছাসেবকেরা, সমস্ত সতর্কতাবিধি মেনে বিনোদনে, শিক্ষাদানে তাদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

করোনা পরিস্থিতিতে সামাজিক, মনোবিদদের বক্তব্যে, লেখনীতে বারবার উঠে এসেছে 'শিশুদের মনের ওপর চাপের কথা। এইপাঁচমাসের বন্দীত্বকে কোনোভাবে মানিয়ে নিলেও সঙ্গীহীন শুকনো অনলাইন ক্লাসে ছোটদের মন বসছে না। বাস্তবে ভাল নেই কোনো বয়সের পড়ুয়াই। বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে কলমে শিক্ষা থেকে দূরে মোবাইলের চার দেওয়ালে চোখ গেঁথে যে পড়াশোনা তারা করছে সেটা স্থবির, যান্ত্রিক। চোখ-মাথা-ঘাড়ে ব্যথা হয়। মানবদেহের ওপর স্মার্ট ফোন বা কম্পিউটারের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে যে সব প্রবন্ধ ঘনঘন চোখে পড়ত, হালে তারাও পরিস্থিতির চাপে সরে গেছে। মাঝখান থেকে দাপিয়ে ব্যবসা করে নিচ্ছে ইন্টারনেটের দুঁদে মার্কিনি দাদারা, তা বলাই বাহুল্য। এদিকে আমাদের মত ঘিঞ্জি গরীব দেশে অসুস্থতা বাড়ছে, দারিদ্র্য বাড়ছে, ক্ষোভ বাড়ছে, ইন্টারনেটের স্পিড বাড়ছে না। ফলে নতুন ক্লাসের জোরকদম প্রস্তুতির আড়ালে, বাতিল পরীক্ষার অসমাপ্ত সিলেবাস ছাত্র-শিক্ষক মিলে মাটি চাপা দিয়ে দিলেও — দেখার কেউ নেই। 'যেমনই চলুক, কিছু পড়াশোনা তো হচ্ছে' — এই স্তববাক্যই এখন ভরসা। অতএব সব কেটে ছেঁটে যা দেখা গেল আমাদের দেশে এখন অনলাইন পড়াশোনার সুবিধে বলতে আড়াইটে — যাতায়াতে সময় বাঁচে, যাতায়াত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচা বাঁচে আর করোনার একঘেঁয়েমি কাটাতে কিছু তো দরকার!

পরিশেষে বলি, ভারতে করোনা মহামারি উত্তরোত্তর যে ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের সেবাক্ষেত্রকে সচল রাখতে একটা বড় সহায় আন্তর্জাল বা ইন্টারনেট। এবং একই সাথে সংযোজন করা দরকার যে — শিক্ষাও

এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে স্বাভাবিক নিয়মে স্কুল কলেজে ঘন্টা বাজবে, ক্লাস চালু হবে আবার। অনলাইন পড়াশোনা তখন চলে যাবে শিক্ষাব্যবস্থার কর্ডলাইনে, মূল ধারা সে কখনোই নয় — জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তা বেশ খোলসা করে বুঝিয়েছে। অতএব এই টালমাটাল সময়টুকু কাটিয়ে উঠতে হবে আমাদের। এক্ষেত্রে সরকার বাহাদুরকে যেমন পরিকল্পনাহীনতায় ভুগলে চলবে না, তেমনি অভিভাবকদের, যুবক-যুবতী পড়ুয়াদেরও এগিয়ে আসতে হবে নিজেদের স্বার্থে, গ্লাভস জড়ানো হাত দিতে হবে সেচ্ছাসেবকদের। অন্যদিকে গান, কবিতা, পুরাণের গল্প, অন্দরমহলের খেলা লোকশিক্ষার এসব মরানদীকেও সংস্কার করতে হবে এই সুযোগে নয়তো আন্তর্জালে জড়িয়ে জাতির ভবিষ্যৎ কূল পাবে না। গ্যাস, আলোর সাথে ইন্টারনেটকেও সহজলভ্য করতে হবে ধীরে ধীরে। নয়তো এইসব অনলাইন প্রতিযোগিতাগুলির ছোটো বড় বহু উদ্যোগ সংক্ষিপ্ত পরিসরে আটকা থেকে যাবে, আর সমাজের প্রকৃত ব্যথারা একলা জন্মে একলা হারিয়ে যাবে দারিদ্র্যসীমার নীচে অন্ধকার ঝুপড়িতে। খবর নিলে হয়তো দেখা যাবে ওদের বারোমাস্যাও কল্পনায় শুরু, বাস্তবে শেষ...

শ্রী শিক্ষায়তন কলেজের বাংলা বিভাগ আয়োজিত আন্তর্কলেজ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় (২০২০) দ্বিতীয় স্থানাধিকারী রচনা

অনলাইন পড়াশোনার সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

সৌমি বসু, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ

হঠাৎ করেই সারা পৃথিবী জুড়ে কেমন জানি একটা অন্ধকার নেমে এলো। স্কুল-কলেজ অফিস-আদালত সব বন্ধ হল, বন্ধ হলো লোকজনের সঙ্গে মুখ দেখাদেখিও। সেদিন যখন অনিল-রা কলেজ গিয়েছিল সেদিন কি তারা বুঝতে পেরেছিল এরপর কবে কলেজ খুলবে তার ওপর রয়েছে গভীর অনিশ্চয়তা।

গল্প শুরুর আগে অনিলের পরিচয়টা জানিয়ে রাখা দরকার। বছর উনিশের অনিল কর্মকারের বাড়ি সুন্দরবন অঞ্চলে। বাবা পেশায় মধু সংগ্রহকারী তাই তাদের আর্থিক অবস্থার কথা বোধহয় আমরা প্রত্যেকেই আন্দাজ করতে পারি। দুচোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে ছেলেটা এসেছিল এই শহরে, এখানে আসবার আগেই সে জেনেছে এই শহর কাউকেই খালি হাতে ফিরিয়ে দেয় না। তাই মাথা গোঁজার ঠাঁই যখন পেয়েই গেছে তখন সেও আর ফিরবে না খালি হাতে। অন্যদিকে অদৃষ্ট যে সমগ্র মানব জাতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নতুন খেলা সৃষ্টি করে রেখেছে তার কথা আর কেইবা জানত। আচমকা একটা রোগ এলো সমগ্র মানবজাতিকে পুরো সর্বস্বান্ত করে দিলো । আমরা পরিচিত হলাম লকডাউনের সঙ্গে। কলেজ বন্ধ, আবার টিউশন বন্ধ হল, তাই অনিল বাড়ি চলে গেল। লকডাউনের প্রথম দশ-বারো দিন এই টানাটানির সংসারে আর্থিক অনটন যে আরও বৃদ্ধি পেল তা আর বলবার অপেক্ষা রাখে না। এর মধ্যেই হঠাৎই একদিন কলেজের ওয়েবসাইটে নোটিশ পড়লো, এখন থেকে যতদিন না পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন অবধি যাবতীয় পঠন-পাঠন ভার্চুয়াল ক্লাসের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে অর্থাৎ অনলাইন ক্লাস। আর এই অনলাইন ক্লাসে কিন্তু যুক্ত থাকবে উপস্থিতির শতাংশ বিচার। এখন অনিল ভাবতে শুরু করলো, ঘরে বসে ভার্চুয়াল ক্লাসে পড়াশোনা, এ যেন এক অভিনব পদ্ধতি, আর এই অভিনব পদ্ধতিতে যাতায়াতের কোনো ঝুঁকি পোহাতে হয় না আর যেখানে যাতায়াত নিষ্প্রয়োজন সেখানে যানবাহনের প্রয়োজন নেই। এক কথায় আধুনিক পৃথিবীর সর্বোত্তম আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ। যেখানে প্রতিদিন কিছুটা সময় আর বেশ কিছুটা ডেটা ব্যয় করলেই মিলবে শিক্ষা। সত্যি তো ! ব্যাপারটা কিন্তু ভীষণ সুবিধাজনক। অন্তত একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এই সামান্য আধুনিকতা আশা করাই যায়। এই সমস্ত কথা বিচার বিবেচনা করলে অনলাইন পড়াশোনা করার সুবিধা বোধহয় সর্বাগ্রে থাকবে, কারণ আধুনিক পৃথিবীতে এই যৎসামান্য আধুনিকতাটুকু না থাকলে এই শতাব্দীতে নিজেদেরকে বড্ড বেমানান লাগবে। সময় এগোচ্ছে আর সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পাল্লা দিয়ে এগোচ্ছে তথ্য ও প্রযুক্তি। আলোর বেগের ন্যায় তথ্য প্রযুক্তির আলো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। প্রতি মুহূর্তে আমাদের জানান দিচ্ছে আমরা এক অতি আধুনিক জনগোষ্ঠী। আমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এত দূর অবধি সবকিছুই মসৃণ পথ ধরে অতিবাহিত হচ্ছিল, কিন্তু একটি প্রদীপ যেমন সমগ্র ঘরকে আলোকিত করলেও নিজের তলদেশকে আলোকিত করতে পারে না, সেই স্থান পূর্ববৎ অবস্থার ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্নই হয়ে থাকে, ঠিক সেইরূপ এই অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় পঠন-পাঠনের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রযুক্তি রূপ দৈত্য যে সমগ্র প্রকৃতিকে গ্রাস করতে পারেনি এটাই বোধ করি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই শিক্ষা ব্যবস্থার সুবিধা অপেক্ষা সীমাবদ্ধতাই বেশি চোখে পড়ে অর্থাৎ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নামাখা চন্দ্র যেরূপ শান্ত স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে অথচ সেই একই মুহূর্তে পূর্ণচন্দ্রের আপন কলঙ্ক আমাদের মনে যেরূপ বিরক্তির সৃষ্টি করে, অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা কিছুটা সেইরূপ। একটি চারদেওয়াল বিশিষ্ট শ্রেণিকক্ষ কেবলমাত্র একটি শ্রেণিকক্ষ বা শিক্ষালাভের স্থান নয়। বরং সেই স্থানে উপস্থিত সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর ভাব আদান প্রদানের একটি বিশেষ জায়গা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক মজবুত হয়ে ওঠবার স্থান। অনলাইন ক্লাস রুমে কিন্তু সেই সুবিধা কিঞ্চিৎ কমই থাকে। এখনে সব কিছুই বড় প্রযুক্তিকেন্দ্রিক, ব্যাপারটা অনেকটাই ''শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি'' এই বাক্যের ন্যায় শুষ্ক। যেখানে চার দেওয়াল বিশিষ্ট শ্রেণিকক্ষও বিশেষ কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও ''শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে'' এই বাক্যের ন্যায় আর্দ্র। এছাড়া আরও একটি মজার ব্যাপার কিন্তু এই ভার্চুয়াল ক্লাসে ভীষণভাবে পরিলক্ষিত হয়, আর তা হলো নিজের উপস্থিতির কথা জানান দিতে কিংবা কোন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে বাক্যালাপ করবার জন্য মিউট ও আনমিউট এই শব্দ দুটির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। সমস্ত ক্লাসের ছাত্র ছাত্রীদের শান্ত করবার উদ্দেশ্যে টেবিলের ওপর ডাস্টার দ্বারা আঘাত করা, কিংবা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মুখ নিঃসৃত কিছু বাক্য, যেমন ''সবাই শান্ত হয়ে বসো' কিংবা 'সাইলেন্ট' এই ধরনের শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। এ যেন প্রকৃতির সহজ সরল নিয়মের ওপর প্রযুক্তির কঠোর বজ্রাঘাত। সময় যেহেতু নির্ধারিত ছকে বাঁধা তাই এখানে শ্রেণিকক্ষের মত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করার কোনো বালাই নেই। না তো আছে সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও এক্সটা ক্লাস নেওয়ার কোনো সুযোগ, কারণ বর্তমানে এই অনিল কর্মকার এর মতো আর্থিক অবস্থা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। তাই কষ্টে সৃষ্টে ডেটা জোগাড় করতে পারলেও তার পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। ফলস্বরূপ অধিক সময়ব্যাপী ক্লাস করাবার ইচ্ছে থাকলেও তা আর সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। আবার অন্যদিকে বিলম্ব হলেও সেই স্থানে পৌঁছানো যায়, কিন্তু নেটওয়ার্কের গতিবিধি যে পথ বেয়ে ধাবিত হয়েছে সেই স্থানে যদি কোনরূপ সমস্যা সৃষ্টি হয় তাহলে আর যাই হোক না কেন সেই দিনের মতো ভার্চুয়াল ক্লাস এর সাথে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতেই হয়। পরিশেষে শুধু একটা কথাই বলবার থেকে যায় অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা হল বর্ষাকালে কেকাধ্বনির ন্যায় সুন্দর কিন্তু চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি শ্রেণিকক্ষের শিক্ষাব্যবস্থা হল বসন্তকালে কুহুধ্বনির ন্যায় মনোরম ও স্নিগ্ধ।

শ্রী শিক্ষায়তন কলেজের বাংলা বিভাগ আয়োজিত আন্তর্কলেজ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় (২০২০) তৃতীয় স্থানাধিকারী রচনা

করোনা পরবর্তী বিশ্ব

সৈরন্ধ্রী দে, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, বেহালা কলেজ

সকাল দশটা বেজে পাঁচ, আপিসে যাওয়ার প্রথম বাসটাতে ভিড়ের জন্য উঠতে পারলেন না সেনবাবু। বড়োই ধোপদুরস্ত সদা সৌখিন তথাপি রসিক মানুষটার কপালে চিন্তার ভাঁজ ফুটে উঠলো। বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে তাঁর এলাকারই জনকতক লোক। চেনা পরিচিত হলেও দূর থেকেই হাত নেড়ে এড়িয়ে যেতে চাইলেন কিন্তু পাশের বাড়ির দত্ত বাবু কাছে এসে কথা না বলা অবধি থামলেন না। এতদিনের Work from home-এর অভ্যেসটা কাটিয়ে কাজের তাগিদেই বেরোতে হচ্ছে আবার সবাইকে, কিন্তু সামাজিক দূরত্ব? অবশ্য ওই Lockdown-এর বাজারেও যেখানে ঠিকমতন সব বিধি ব্যবস্থা মানা হয়নি সেখানে এখন সব কিছু বিধি মানা হবে এই আশা করাটাই উচিত না। নিজেকে সাবধান থাকতে হবে। পকেট থেকে স্যানিটাইজার বার করে আর একবার হাতটা পরিষ্কার করে নিলেন। মুচকি হেসে ভাবলেন কবীর সুমনের কথা তো এখন হুবহু মিলে যাচ্ছে। ''কাশির ধমক থামলে কিন্তু বাঁচতে ভালবাসি, হাল ছেড়োনা বন্ধু''। সত্যিই কি দিনকাল পড়লো হ্যাঁ!

কলকাতা শহরের মধ্যবয়স্ক এই বাসিন্দা আজ যেন তামাম বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষের উদাহরণ। স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে স্থান আর পাত্রের পরিবর্তন হচ্ছে কেবল, কালটা কিন্তু আটকে রয়েছে সেই করোনা পরবর্তী লগ্নে। এই মহামারি আদতে আমাদের যেমন আমূল ক্ষতি করেছে তেমনই কিন্তু আমাদের আবার নতুন করে বাঁচা শিখিয়েছে। আসলে প্রত্যেকটা ঐতিহাসিক মহামারি মানুষের অতীতের জীবন-যাপনকে ভেঙ্গে তার কল্পনার জগতে এগিয়ে চলতে বাধ্য করে। এই Covid-19-ও এর ব্যতিক্রম নয়। এই মহামারি একটা পুরোনো ভাঙাচোরা বিশ্ব থেকে একটা নতুন বিশ্বে পদার্পণ করার প্রবেশদ্বার মাত্র। এই মহামারিটি বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার সীমা পরীক্ষা করে চলেছে। হ্যাঁ বিশ্বব্যাপী সহযোগিতাই বটে। এই প্রচন্ড সংকটের সময়ে মানুষ যদি একে অপরের পাশে না থাকে তাহলে এই দুর্যোগ অতিক্রম করা এককথায় দুরূহ।

বিগত চার দশক ধরে নগরায়ণ আর বিশ্বায়ন এই দুটি পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী দুটি চালক। বিশ্ব বাণিজ্যে ১৯৮০ সালে বিশ্বের জিডিপির ৪০%-এর চেয়ে কম হয়ে আজ ৬০%-এর উপরে। একই সময়ের মধ্যে, শহরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা আজ দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে ৪ বিলিয়নেরও বেশি — বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি। বিভিন্ন সংস্থা তথা গবেষকদের মতে COVID-19 এই উভয় প্রবণতা বিপরীত করবে, দেশ এবং মানুষের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে তুলবে। সুরক্ষা এবং স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর জন্য কেউ কেউ এই পরিবর্তনগুলির প্রশংসা করবে। তবে এমন একটি বিশ্ব যা কম বৈশ্বিক এবং কম শহুরে ও কম সমৃদ্ধ, কম স্থিতিশীল এবং কম পরিপূর্ণ হবে।

COVID-19-এর পরবর্তী বিশ্ব সম্পর্কে দুটি মূল পূর্বাভাস দেওয়া যেতে পারেঃ কম বৈশ্বিক, আর বিচ্ছিন্ন। COVID-19 এর আগেও বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সরবরাহ শৃঙ্খল এবং লোক প্রবাহের চূড়ান্তভাবে বিশ্বায়নের দিকে কয়েক দশকের দীর্ঘ প্রবণতা বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করেছিল।

পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে, আমরা যদি ২০০৮ সালের আর্থিক সঙ্কটের ঠিক আগের বছরগুলির ''শীর্ষ বিশ্বায়ন'' হিসাব দেখি

তবে সেই থেকে মন্দা, বৈষম্য এবং জনবহুলতার সংমিশ্রণ পশ্চিমা দেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান বিশ্ব-বিরোধী ও অভিবাদনবিরোধী ঐক্য তৈরি হয়েছে, যা চীনের সাথে মার্কিন বাণিজ্য যুদ্ধের উদাহরণ হিসাবে রয়েছে।

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে উন্নত অর্থনীতির প্রতিক্রিয়া এই ঐক্য শক্তিশালী করতে পারে, যেহেতু আন্তর্জাতিক সমস্ত বিষয়কে অপ্রয়োজনীয় এবং বিপজ্জনক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হলেও হতে পারে।

আমাদের বলা হচ্ছে এই বিশ্বব্যাপীকরণ আমাদের সকলকে আরও দৃঢ়তর করে তুলবে। তবে এটি আমাদের কম সমৃদ্ধ করবে — কম পছন্দ এবং উচ্চতর দাম সহ এটি আমাদের কম সুরক্ষিতও করতে পারে, কারণ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা হ্রাস পাবে এবং আন্তর্জাতিক সংঘাতের সম্ভাবনা বাড়বে।

কম ঘনত্ব আরও বেশি দূরত্ব। নগরায়ণ করোনা ভাইরাসের অন্যতম বড় দুর্ঘটনা হতে পারে। বিশ্বায়নের বিপরীতে, সর্বকালের বৃহত্তর-নগরায়ণের প্রবণতা বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটে প্রভাব ফেলেনি। এমনকি আমেরিকা — সমস্ত কিছু শহরতলির শহর — শহরতলিতে গ্লোবাল মার্চে যোগ দিয়েছে। মানুষ কেবল অর্থনৈতিক সুযোগের জন্যই নয় শহুরে আধুনিক জীবনযাত্রার জন্যও শহরে আকৃষ্ট হয়েছিল।

করোনা ভাইরাস পরে লোকেরা ভিড় করা ট্রেন এবং বাস, ক্যাফে এবং রেস্তোঁরা, থিয়েটার এবং স্টেডিয়াম, সুপারমার্কেট এবং অফিসগুলি সম্পর্কে আরও বেশি ভয় পাবেন। জনাকীর্ণ স্থানগুলি শহরগুলির প্রাণবন্ত। তবে এখন জনসমাগমকে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি হিসাবে দেখা হচ্ছে। যে সমস্ত লোকেরা শহর ছাড়ার ক্ষমতা রাখে তাদের ক্রমশ প্ররোচিত করা হবে। যে ব্যক্তিরা ছেড়ে যেতে পারে না তারা বর্ধিত ঝুঁকি বোধ করবে।

নগরায়ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষতি করবে কারণ শহরগুলি প্রচুর পরিমাণে অর্থনীতি তৈরী করে এবং সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনের লক্ষণীয়ভাবে কার্যকর ইনকিউবেটার হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। এটি বিশেষত উন্নয়নশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে সত্য হতে পারে যেখানে গ্রামীণ অঞ্চল থেকে দ্রুত সম্প্রসারিত শহরগুলিতে মানুষের চলাচল সম্ভবত দারিদ্র্য হ্রাসের মূল চালিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে শহরগুলি সংকুচিত হওয়ার ফলে অন্যান্য প্রতিকূল প্রভাবও পড়বে, সাংস্কৃতিক প্রাণবন্ততা এবং মহাজাগরীয়তা হ্রাস করা থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তনকে তীব্রতর করা। আরও উৎপাদনশীল হওয়ার পাশাপাশি, শহরগুলি আরও পরিবেশগতভাবে টেকসই হতে থাকে।

একটা বিশ্ব যা কম বৈশ্বিক এবং কম শহুরে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে অনেক কম আবেদনযোগ্য। তবে এটি এমন একটি বিশ্ব যা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে, বৈষম্যমূলক মানুষের মধ্যে ভাগ্যবোধকে হ্রাস করবে এবং তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে।

COVID-19-তে আমাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া আমাদের উভয়ের ডি-বিশ্বায়ন করতে এবং নগরায়ণ করতে চায়। তবে আমাদের অবশ্যই এটি করার গভীরতর-মেয়াদী ব্যয়কে পুরোপুরি বিবেচনা করতে হবে। বিশ্বায়ন ও নগরায়ণ আমাদের চ্যালেঞ্জ তৈরি করে যা আমাদের অবশ্যই মুখোমুখি হতে হবে, আরও অনেক বেশি পোস্ট-করোনাভাইরাস বিশ্বে। সমাধান হল তাদের পরিচালনা করা, তাদের বিপরীত না।

এই সংকটটি কিছুটা উদ্বেগজনক, কারণ এতে বেশ কয়েকটি নতুন এবং অপরিচিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট একটি বিশ্বব্যাপী মেডিকেল জরুরি অবস্থা বিশ্ববাসী এখনও পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। একটি স্ব-ক্ষতিযুক্ত অর্থনৈতিক বিপর্যয়-এর প্রসারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় নীতিগত প্রতিক্রিয়া হিসাবে। তবুও সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে

এও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এই সঙ্কট নিয়ে সবচেয়ে বেশি যে সমস্যা হচ্ছে তা মোটেই নতুন নয়। COVID-19 সংক্রমণের মারাত্মক প্রকরণ এবং ফলাফলগুলি বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যগুলি প্রতিফলিত করে বলে মনে হয়। ''মূল কর্মীরা'' যা করেন তার সামাজিক মূল্য এবং তারা প্রাপ্ত কম স্বল্প বেতনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিল নেই যা সত্যিকার অর্থে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মূল্য দিতে বাজারের পরিচিত ব্যর্থতা অনুসরণ করে।

এক দশক ধরে ক্রমবর্ধমান জনবহুলতা এবং বিশেষজ্ঞদের উপর বিশ্বাস হ্রাসের ফলে ভাইরাস সম্পর্কে ভুল বাক্য এবং ভুল তথ্য দেওয়ার সুখী আলিঙ্গনটি আশা করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ''আমাদের দেশের প্রথম'' বিশ্বে রাজনীতি উদ্‌যাপনের পরে, সঠিকভাবে সমন্বিত আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার অনুপস্থিতিতে অবাক হওয়া উচিত ছিল না।

সংকটকে তখন আরও আক্ষরিক অর্থে প্রকাশ করে আমাদের সম্মিলিত মনোযোগকে আমরা যেভাবে একসাথে বাস করি তার মধ্যে, ইতিমধ্যে বিদ্যমান অনেক অনাচার এবং দুর্বলতার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। লোকেরা যদি আগে এই ত্রুটিগুলি সম্পর্কে অন্ধ থাকে তবে এখনই এটি না দেখানো কঠিন।

COVID-19 এর পরে পৃথিবী কেমন হবে? পরবর্তী দশকে আমরা যে সমস্যার মুখোমুখি হব তা আজকের দিনের সমস্যার চূড়ান্ত সংস্করণও হতে পারে। তবে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সর্বোন্নত অভিযোজিত প্রাণীটি আজ যদি বিশ্বকে বাঁচানোর দায়ভার না নেয় তাহলে বিজ্ঞান আর ইতিহাসের একত্র হা হুতাশ শুনতে হবে। তবে বিশ্বের প্রতিটি মানুষই জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে একটি আশাই পোষণ করে যেন এই পৃথিবী আবার আগের মতন স্বাভাবিক ও সুস্থ হয়। দিনের শেষে সব মানুষই চায় ''আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে''। এবার আমাদের সবার একযোগ হওয়ার পালা। সবার একসঙ্গে বলার পালা ''এভাবেও ফিরে আসা যায়''।

মৃত্যু

সুদীপ্তা সাহা, প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

মৃত্যু পাশে এসে বসে —
চুপটি করে।
মৃত্যু এসে ছুঁয়ে যায় নাম না জানা যন্ত্রণায়।

আমার বহু স্বপ্নে মৃত্যুরা ধরা দেয়,
ঘুম ভেঙে কপালের ঘাম মোছার আগেই
উঁকি দেই পরিচিতে!

বিড়ালের চিৎকারে মৃত্যুরা ধরা দেয়,
অস্থির হয়ে আমার সঙ্গে বিছানায় এপাশ-ওপাশ
করতে থাকে পিছুটানরা !

মৃত্যু কাছে এসে বসে —
শান্ত শীতল স্পর্শ ছড়িয়ে যায় শিরায়।
মৃত্যু পাশে এসে বসে —
চুপটি করে।।

পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়

শ্রেয়সী দে, প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়
আর কটা দিন পরে,
থাকবে কি এই সাধের প্রাসাদ
রূপ কি যাবে ঝরে?
থাকবে কোথায় তোমার আমার
আপন পরিজন,
যাদেরজন্যে প্রাণ প্রণিপাত
সারাটি জীবন।
থাকবে কি আর সবুজ বরণ
নীলকণ্ঠ পাখি,
সকাল সন্ধ্যে গাছের ডালে
করবে ডাকাডাকি?
থাকবে কি আর হানাহানি
জাতি-ধর্ম নিয়ে,
কার রক্ত মিশলো কোথায়
কে দেখবে গিয়ে?
কে বলবে, 'ওরে বর্বর;
এখান থেকে ভাগ,
সাহস বড়, এক হতে চাস
মূর্খ মেনি ছাগ'।
চলবে কি এই রেষারেষি
সেটাই বড় ভয়।।

বৃষ্টি

অনুষ্কা নন্দী, ষষ্ঠ সেমিস্টার, ইংরেজী বিভাগ

সেদিন বৃষ্টি পড়েছিল।
যেদিন সদ্যোজাত আমি আর এক সদ্য হওয়া মা প্রিয়জনের অপেক্ষায় ছিল বসে —
আকাশ ভাঙ্গা জলতরঙ্গে বেজেছিল বিচ্ছেদের সুর।

সেদিন বৃষ্টি পড়েছিল।
যেদিন অমাবস্যার কালোতে মিশে গিয়েছিল একটা পুরুষের মত ছায়া —
শৈশবের নিঃশব্দ চিৎকার ঢাকা পড়েছিল পাল্টা মেঘের গর্জনে।

সেদিন বৃষ্টি পড়েছিল।
যেদিন প্রথম প্রেমের প্রথম বিচ্ছেদ ভাসিয়েছিল সব বৃষ্টি ভেজা স্মৃতি —
একলা আমার নিঃশ্বাসে বিষাক্ত ছিল বাতাস।

কিন্তু,
সেদিনও বৃষ্টি পড়েছিল।
যেদিন হঠাৎ আমার একলা পায়েই ছন্দ লাগলো অবিরাম —
হৃদয়ের এক অচেনা বোলে সঙ্গীত হল বর্ষা।

বিভাগীয় নানা কিছু (২০২০–২০২১)

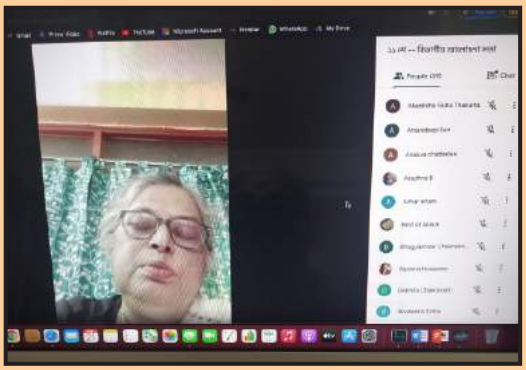

ভাষাদিবস ২০২১
অধ্যাপক ড. গোপা দত্তভৌমিক

২২শে শ্রাবণ ঃ রবীন্দ্র স্মরণ
অধ্যাপক ড. অভ্র বসু

অধ্যাপক ড. সংযুক্তা দাশগুপ্ত
প্রাক্তন কলা অনুষদ (ডিন), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আন্তর্জালিক আলোচনা সভা
অধ্যাপক ড. অর্পিতা ভট্টাচার্য্য

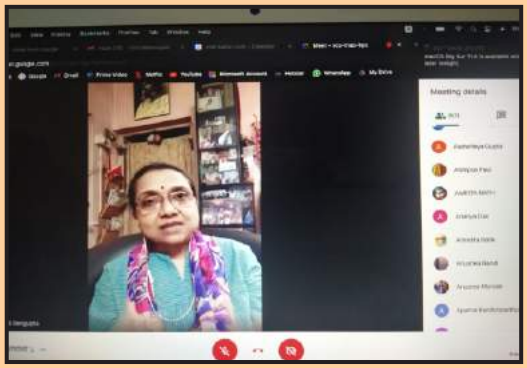

বিশেষ বক্তৃতা
অধ্যাপক ড. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত

বিভাগীয় অনুষ্ঠানসূচী

২০২০–২০২১ শিক্ষাবর্ষ

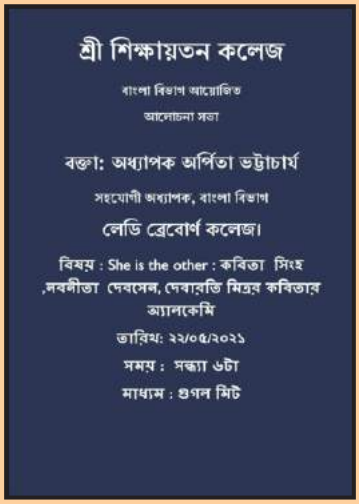

বিভাগীয় অনুষ্ঠান (২০১৯–২০২০)

ভাষা দিবস ২০২০

ভাষা দিবস ২০২০
সাহিত্যিক শ্রী নলিনী বেরা

◀ ভাষা দিবস ২০২০

সৃজনশীল রচনা প্রতিযোগিতা ▶

◀ বিশেষ বক্তৃতা
অধ্যাপক ড. শামিম আহমেদ

ঐন্দ্রিলা দাস, ষষ্ঠ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

প্রতিচ্ছবি

বিপাশা হাওলাদার, ষষ্ঠ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

বিশ্ব পিতা

কপালে আর হাতে ব্যান্ডেড লাগিয়ে, ক্লাস সেভেনে পড়া বুবলাই, ঘরে ঢুকেই মাকে জড়িয়ে ধরল। হতভম্ব তিস্তা কিছু বুঝে ওঠার আগেই, বুবলাই বলল, স্কুল বাস থেকে নেমে রাস্তা ক্রস করতে গিয়ে একটা ছুটন্ত বুলেট বাইকের সাথে ধাক্কা লাগার ঠিক আগের মুহূর্তে হঠাৎ করে Krrish-এর মত একজন আঙ্কেল এসে তাকে জড়িয়ে ধরে খানিকটা প্রায় উড়ে গিয়ে পাশের ফুটপাতে গিয়ে পড়ে। তারপর একটা অর্ফ্যানেজে গিয়ে, আঙ্কেলটা বুবলাইকে ব্যান্ডেড-ওষুধ লাগিয়ে, একটা চকলেট দিয়ে, সেখানকার সব বাচ্চাদের সাথে আলাপ করিয়ে দিলো। সবাই আঙ্কেল টাকে বাবু বলে ডাকে। সবটা শুনে, তিস্তা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আদর করল, আর ধন্যবাদ জানাতে বুবলাইকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলো সেই অনাথ আশ্রমে। বুবলাই-এর Krrish কে দেখে তিস্তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। নিজেকে সে ক্ষমা করতে পারলো না।

কোনোদিনও বাবা হতে পারবে না জানার পর, একদিন যার মুখে তিস্তা ডিভোর্স এর নোটিশ ছুড়ে দিয়েছিল, সেই ঋভুই আজ কয়েকশো শিশুর পিতা।

আজকের দুর্গা

— ভাই তাড়াতাড়ি কর। হাতে বেশি সময় নেই। দশটার মধ্যে বসের টেবিলে অন্তত পাঁচটা তাজাখবর জমা পড়তেই হবে। কাল কিন্তু উইমেন্স ডে স্পেশাল-এ 'পেজ থ্রি'-তে আমাদের রিপোর্টেড নিউজ গুলোই দেখতে চাই।

— হ্যাঁ ভাই, আগেরবার সুযোগটা হাতছাড়া করেছিলাম। আর না। চল, ফেমাস উইমেনদের সম্বর্ধনা জানিয়ে, তাদের ইন্টারভিউ নেব।

এই ধর... কোনো বিজ্‌নেস ওম্যান বা পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট বা কোনো অ্যাক্ট্রেস।

— চল চল। কিরে ঋভু। হাঁ করে বসে কি এত ভাবছিস ?

— ভাবছি... যে মেয়েটা, নিজের সমস্ত সখ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে, পঙ্গু ভাই ও বিধবা মায়ের সংসার চালাবার জন্য, রোজ রাতে দুশ্চরিত্রার তকমা লাগিয়ে টাকা রোজগার করছে, তার ইন্টারভিউ নিবি না! যে মেয়েটা অ্যাসিডে আক্রান্ত হয়ে, নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য, এখনও সমাজের সাথে লড়ে যাচ্ছে, তাকে বাদ দিয়ে দিবি! তাকে সম্বর্ধনা জানাবি না! যে মেয়েটা সারাদিন লোকের বাড়ি কাজ করে, বাড়ি ফিরে, মাতাল স্বামীর কাছে মার খেয়েও অসুস্থ শ্বশুরের সেবা করে যাচ্ছে, তাকে এত সহজে ভুলে যাবি! গোঁফ দাড়ি থাকা সত্ত্বেও যে মানুষটা শাড়ির ভাঁজ আর লিপস্টিকের রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নেওয়ার জন্য সমাজের সাথে লড়ে যাচ্ছে, সেই নারী সত্তাকে 'হ্যাপি উইমেন্স ডে' উইশ করবি না ?

হঠাৎ যদি

ধরো, একদিন এক নিমেষে সব পাল্টে গেল!

আমাদের রাজত্বে আমরা সবাই রাজা, কোনো প্রজা নেই!

সকালে উঠে, নাকে রুমাল চাপা দিয়ে আর হাতে গ্লাভস প'রে সিদ্ধার্থ বাবু দু'হাতে ময়লার থলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন শহরের গার্বেজ বিনে ময়লা ফেলতে। রমেশ বাবু প্যান্টের ভেতর শার্ট গুজে, টাই প'রে অফিসের জন্য রওনা দিচ্ছেন, এমন সময় কড়া গলায়, তার স্ত্রী পিছু ডাকলেন। স্ত্রীর আজ্ঞা অমান্য না করে, ট্রাউজার্স দুটো হাঁটুর ওপর তুলে, তিনি বেসিনের পাইপ ঠিক করতে শুরু করলেন। মুখে ফেসপ্যাক মেখে সুমিতা বৌদি বসলেন কলতলায় বাসন মাজতে। আলোকলতা দেবী গা ভর্তি গহনা প'রে, আঁশ বটি দিয়ে মাছ কাটতে বসলেন। চৌধুরী পরিবার নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে। তাদের মেজ ও সেজ ছেলে, স্যুটেড-বুটেড হয়ে, ভ্যান চালিয়ে মালপত্রগুলো এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। হাউসিং সোসাইটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে একটি পরিবারের যেকোনো একজন সদস্যকে ল্যাট্রিন পরিষ্কার করার দায়িত্ব দেওয়া হল।

কি মশাই ? চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল! কপাল দিয়ে যে ঘাম ঝরছে! এখনও সময় আছে... যাদের জন্য পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকতে পারছেন, তাদেরকে শ্রমিক বলে হেও না করে, মানুষ হিসেবে গণ্য করে যোগ্য সম্মান দিতে শিখুন।

এপ্রিল ফুল

— এই ঋভু, কাল তো পয়লা এপ্রিল। একটা জব্বর প্ল্যান বানা তো, যাতে সবাইকে বোকা বানাতে পারি।

— বোকা বানাতে নির্দিষ্ট কোনো দিন লাগে নাকি! কিছু মানুষ তো বোকা বোনেই সারা জীবন কাটিয়ে দেয়।

— কি বলছিস! কারা?

— এই ধর...যে মেয়েটা তার বয়ফ্রেন্ডকে বিশ্বাস করে, বাড়ির লোকের সাথে ঝগড়া করে, একরাশ ঝুটো স্বপ্নের কাজল মেখে, ম্যারেজ রেজিস্টার অফিসের সামনে আজও অপেক্ষারত। বা সেই ছেলেটা, যে তার সমস্ত উজাড় করে তার প্রিয়াকে ভালোবাসে, অথচ মেয়েটা আজকাল তার অজান্তেই অন্য কারোর সাথে দরজা আটকায়। বা ধর, অ্যাক্টিং জগতে নিজের প্রতিভা প্রকাশ করার লোভ সামলাতে না পেরে, যে বোকা মেয়েটা সেই দিন ডিরেক্টরের এককথায় রাজি হয়ে গেছিল। বা, দিনরাত খাটাখাটনি করে স্বামীর হাতে রোজ মার খেয়েও যে মেয়েটি মুখ বুজে, আজও অতি নিষ্ঠার সাথে তার স্ত্রীর ধর্ম পালন করছে, মনে এই মিথ্যে আশা নিয়ে যে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। বা, সেই বাচ্চাটা, যে বাবার পথ চেয়ে আজও দরজার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে, এই আশা নিয়ে যে তার বাবা এক্ষুনি বর্ডার থেকে ফিরে এসে সোনাই বলে তাকে কোলে তুলে জড়িয়ে ধরবে। বা সেই বৃদ্ধা মা, যে আজও মিথ্যে স্বপ্ন বোনে, যে একদিন তার খোকা, স্ত্রীর কথা অমান্য ক'রে, ঠিক তার মাকে বৃদ্ধাশ্রম থেকে নিয়ে যাবে।

তাদেরকে আর নতুন করে কি এপ্রিল ফুল বানাবি? তারা তো শুধু এপ্রিল মাস নয়, গোটা বছর ধরেই, মিথ্যে আশা বুকে চেপে রেখে বোকা বনে দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে।

বাংলার লোকনৃত্য

নাজিমা খাতুন, ষষ্ঠ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

বাংলার লোকনৃত্য ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবিবর্তনের পথ দিয়ে বর্তমান সময়ে জনপ্রিয় স্থান নিয়েছে। ভারতীয় নৃত্যকলা একটি গতিশীল ধারা । এই নৃত্যকলার শাখায় লোকনৃত্য হলো সার্বিকভাবে লোকায়ত সংস্কৃতির একটি মৌল উপাদান। বাংলা লোকসংস্কৃতির অঙ্গভঙ্গি কেন্দ্রিক শাখার অন্তর্গত লোকনৃত্য ।

নৃত্য হচ্ছে শারীরিক ভাষা, অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে ভাব প্রকাশের মাধ্যম। বাংলার লোকনৃত্যের অর্থ বঙ্গদেশের আবহাওয়ায় ও এ অঞ্চলের লোকসমাজে গড়ে ওঠা নৃত্য।

সামগ্রিকভাবে দেখলে ভারতীয় নৃত্যের ক্রমবিকাশে যে সমস্ত নাচ এসেছে তার সঙ্গে লোকনৃত্যের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

মূলত ভারতে প্রচলিত নৃত্যকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি — ১) আদিবাসী নৃত্য, ২) লোকনৃত্য, ৩) ধ্রুপদী নৃত্য অথবা শাস্ত্রীয় নৃত্য ।

আমাদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা আদিবাসী নৃত্য ও লোকনৃত্য এক, কিন্তু তেমন ঠিক নয়। কারণ আদিবাসী নৃত্যে আদিবাসী উপজাতির সমাজ থাকে, সেটা একটি নির্দিষ্ট জনসমাজের নৃত্য, এবার আমরা যাকে লোকনৃত্য বলছি সেটাও কোনো সমাজেরই নৃত্য । তাহলে এদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আমরা যদি ভারতীয় নৃত্যের বিকাশের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে জানবো আদিবাসী নৃত্য থেকে লোকনৃত্য এসেছে এবং লোকনৃত্য থেকে উচ্চাঙ্গ নৃত্য এসেছে।

এবার জানা দরকার আদিবাসী নৃত্য থেকে কিভাবে লোকনৃত্য আসছে। আদিবাসী নৃত্যের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, সেখানে যখন স্থানীয় প্রভাব এসে পড়ছে যেমন নানা আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এর সাথে সাথে তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে সামাজিক আর্থিক প্রভাব পড়েছে, তখনই আদিবাসী নৃত্য লোকনৃত্যে পরিবর্তিত হয়েছে।

লোকনৃত্য আবার পরিশীলিত নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার উপযোগী হওয়ার জন্য যখন মার্জিত হয়েছে তখন সেই লোকনৃত্য শাস্ত্রীয় নৃত্যে পরিণত হয়েছে।

ভারতবর্ষে যে ষোড়শ জনপদের সৃষ্টি হয়েছিল সেই ষোড়শ জনপদ থেকেই আমাদের নগরায়নের উৎপত্তি, সেই ষোড়শ জনপদের উৎপত্তির আগে কোন ধ্রুপদী নৃত্য ছিল না, শুধুমাত্র ছিল লোকনৃত্যই।

ধ্রুপদী নৃত্যের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে লোকনৃত্যের বিভিন্ন উপাদান সক্রিয়ভাবে রয়েছে। প্রতিটি ধ্রুপদী নৃত্য লোকনৃত্য থেকে পরিশীলিত সংগঠিত হতে হতে নাগরিক চাহিদা বা নগরায়নের দাবিতে উচ্চাঙ্গ নৃত্যে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং বিবর্তনের এই ক্রমানুসারে বলা যায় আদিবাসী নৃত্য হচ্ছে জনক। মানুষ ক্রমশ নগরায়নের দিকে এগিয়েছে এবং এই পরিবর্তন হতে থেকেছে। লোকনৃত্য নিয়ে আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হলেন গুরুসদয় দত্ত, তিনি বাংলার লোকনৃত্য

নিয়ে কাজ করেছেন । তিনি বাংলার লোকনৃত্যকে ১১টি ভাগে ভাগ করেছেন । কাঠি নাচ, কালী নাচ, গম্ভীরা নৃত্য, ঘোড়া নাচ, ছৌ নাচ, রায়বেশে নাচ, দান্ডা নাচ, ঢালি নৃত্য, নাচনি, ঢাকী নৃত্য, পুতুল নাচ।

- লোকনৃত্য — লোকনৃত্য মানব সংস্কৃতির আদিমতম শিল্প । মূলত গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজ দ্বারা চর্চিত অঙ্গ সঞ্চালন ধারা বা নৃত্যকেই মূল স্তরে লোকনৃত্য বলে।

  লোকনৃত্যর বৈশিষ্ট্য ঃ

  ১। ভৌগলিক সংস্থানের বৈচিত্র্য অনুযায়ী লোকনৃত্য গড়ে ওঠে। অঞ্চল অনুযায়ী এর অঙ্গ-সঞ্চালন নির্ভর করে। যেমন পার্বত্য অঞ্চলের নাচের পা তুলে তুলে ফেলা পাহাড়ের লম্বা লম্বা গাছের মাথা দোলানোর মতোই শরীরের ঊর্ধ্বভাগ দোলে। অরণ্য অঞ্চলের নাচে থাকে সতর্ক এবং হিংস্র দৃষ্টি, উন্মাদ অঙ্গচালনা ও উঁচু উঁচু লাফ দেওয়া। সমতলভূমির নাচ মেয়েদের শান্ত কোমল এবং পুরুষের ধীরোদাত্ত নৃত্যভঙ্গি ও অঙ্গচালনা এবং আনন্দই থাকে প্রধান।

  ২। লোকনৃত্য সাধারণত কোন উৎসব বা ধর্মাচরণের অঙ্গ।

  ৩। লোকনৃত্য একটি গোষ্ঠী নৃত্য । ব্যক্তি প্রাধান্য এখানে থাকে না, দলবদ্ধতা রয়েছে।

  ৪। লোকনৃত্য আঞ্চলিক এবং অঞ্চল অনুসারে বাদ্যযন্ত্র সংগীত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অংশগুলির সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়।

  ৫। এই নাচের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্রুতলয়, এছাড়া মধ্য ও বিলম্বিত লয়ও থাকে। বিষয়ভিত্তিক দাবি অনুযায়ী লয় হয়।

  ৬। এই নৃত্যের গতি বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার হয়। ''স্কোয়ার'' বা ত্রিকোণ হয় না ।

  ৭। লোকনৃত্যের অংশ হিসাবে মুখোশ, মুকুট, কোন বিশেষ উদ্ভিদের অংশ ব্যবহৃত হয়।

  ৮। লোকনৃত্যে অনেক সময় মঞ্চসজ্জা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকৃতির কাছাকাছি অনুষ্ঠিত হয় এবং দর্শকাসন সাধারণত চারিদিক থেকেই সজ্জিত থাকে।

  ৯। লোকনৃত্যের পোশাক পরিচ্ছদ এবং বাদ্যযন্ত্র বাহুল্যবর্জিত এবং কমদামি হয়। লোকনৃত্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বতস্ফূর্ত এবং তাৎক্ষণিক তাই অনেক সময় দর্শকাসন থেকেও শিল্পী সমাগম ঘটে।

  ১০। গ্রাম্য জীবনের নানা বয়সের নানামুখী ভিন্ন মনোবৃত্তির ভিন্নদৈহিক বৈশিষ্ট্য যে মানুষ যখন একত্রিত হয়ে নাচ করেন নারী-পুরুষ উভয় তখন তাদের এই ভিন্নতা আর থাকে না ।

  ১১। লোকনৃত্য শাস্ত্রীয় প্রভাব মুক্ত হয়, এই নৃত্যে কোনো মুদ্রাভিনয় থাকে না, লোকনৃত্যের ভাব সরাসরি অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়।

  বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় লোকনৃত্য 'ছৌ' সম্পর্কে কিছু কথা —

- **ছৌ নৃত্য**

  দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ ও তৎ সংশ্লিষ্ট উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারী ধর্মীয় আচারনিষ্ঠ লোকনৃত্য নাট্যের নাম ছৌ নৃত্য নাট্য। ছৌ নৃত্য পশ্চিম রাঢ় বঙ্গের অন্তর্গত পুরুলিয়া জেলার জনপ্রিয় নাচ। এছাড়াও সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত, বঙ্গ — উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত।

- পূর্ব ভারতের সেরাইকেলা (বিহার), ময়ূরভঞ্জ (উড়িষ্যা), পুরুলিয়া (বাংলা) ছৌ নৃত্যের এই তিন ধারায় উপবর্গ লক্ষ্য করা যায়। ছৌ নৃত্যের এই তিনটি ধারার পার্থক্য নির্ণয় করা যায় মূলত মুখোশের সাহায্যে। পুরুলিয়া ও সেরাইকেলার নৃত্যধারায় ছৌ নৃত্য শিল্পীরা মুখোশ পরিধান করেন। এবং ময়ূরভঞ্জের ছৌ নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার নেই।
- ছৌ নৃত্যের এই ত্রিধারাতেই মুখাভিনয় ও হস্তাভিনয়ের কোন স্থান নেই।
- অঞ্চলভেদে বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণ বৈশিষ্ট অনুসারে এই নৃত্যের নাম বিভিন্নভাবে উক্ত হলেও (ছো, ছ, ছট, ছাউ) এর সর্বজনবোধ্য সুপরিচিত নাম ''ছৌ''।
- চৈত্র মাসের শেষ থেকে প্রায় গোটা আষাঢ় মাস পর্যন্ত যতদিন ভালো করে বর্ষা না নামে ততদিন ছৌ নাচ হয়।

  রামায়ণ-মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণের কাহিনীই এই নাচের মাধ্যমে টুকরো টুকরো ভাবে পালার মধ্যে দিয়ে হাজির করা হয়। তবে কোনো কোনো জায়গায় রাজা দশরথের পুত্রোষ্টি যজ্ঞ থেকে আরম্ভ করে রাবণবধ পর্যন্ত সম্পূর্ণ রামকাহিনী নিয়ে সারারাত ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।
- এই নাচের মূল আকর্ষণ হচ্ছে মুখোশ। মুখোশগুলি ভারতীয় কুরাণের বিভিন্ন দেবদেবী, দৈত্য রাক্ষস, নর, বানর চরিত্রগুলির অনুকরণে তৈরী করা হয়।
- ছৌ নাচের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে কোন গান সংযুক্ত নেই কিন্তু প্রত্যেক পালার আগে সেই পালার পরিচয় সূচক একটি করে গান গাওয়া হয় ।
- খোলা আকাশের নিচে যাত্রার মতো গোল আসরে মাটির ওপর এই নাচ হয় । কোন মঞ্চসজ্জা থাকে না।
- ছৌ নৃত্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পূর্বে কেবলমাত্র পুরুষ শিল্পীরাই অংশগ্রহণ করত।
- দেহ ভঙ্গিতে আক্রমণ প্রতিরোধ ও যুদ্ধপ্রস্তুতি দেখা যায়, লাফ দিয়ে শূন্য থেকে এক হাঁটু বা দুই হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়া, শূন্যে ঘোড়া বা বাঘ সিংহ হনুমান-এর অনুকরণে লাফ দেওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন প্রক্রিয়া এই নাচে দেখা যায়।
- ছৌ নাচে মুখে মুখোশ থাকার ফলে মুখের অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয় না বলে শিল্পী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কম্পন ও সংকোচন-প্রসারণের মধ্য দিয়ে চরিত্রের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ছৌ নাচের অঙ্গ সঞ্চালনকে মস্তক সঞ্চালন, স্কন্ধ সঞ্চালন, বক্ষ সঞ্চালন, উল্লম্ফন এবং পদক্ষেপ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। বাজনার তালে হাত ও পায়ের সঞ্চালনকে চাল বলা হয়ে থাকে। ছৌ নাচে দেবচাল, বীরচাল, রাক্ষসচাল, পশুচাল প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের চাল রযেছে। চালগুলি ডেগা, ফন্দি, উড়ামালট, বাঁহি মলকা, মাটি দলখা প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত।
- জনপ্রিয় ছৌ নৃত্য শিল্পীর নাম গম্ভীরা সিংমুরা । পুরুলিয়ার ছৌ নাচের ইতিহাসে নেপাল মাহাতো, ধরমজয় মাহাতো, দুর্গাচরণ মাহাতো, মলয় মাহাতো প্রমুখ ছৌ নৃত্য শিল্পীরা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

- লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ — সম্পাদনায় দুলাল চৌধুরী, পল্লব সেনগুপ্ত
- বাংলার লোকনৃত্য — আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
- লোকনৃত্য - ছৌ — ড. শান্তি সিংহ

চিঠি

সৃজিতা চক্রবর্তী, ষষ্ঠ সেমিস্টার, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ

মা,

এবারও চিঠি দিতে সেই দেরি করেই ফেললাম। এতো ব্যস্ত জীবন কাটছে আজকাল। অফিস থেকে ফিরে জুতোটা অবধি না খুলে বিছানায় চিৎপাত। মনের ক্লান্তিটা অনেক বেশি করে জাঁকিয়ে বসে। স্বপ্ন হাতড়াতে হাতড়াতে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। তোমার মুখটা তখন খুব মনে পড়ে মা। তুমি কেমন সাদা-লালপেড়ে শাড়ি ঘুরিয়ে পড়তে, গুঁড়ো সিঁদুর দিয়ে নিখুঁত টিপ আঁকতে, আমি অবাক চেয়ে আলতা পরা দেখতাম, লক্ষ্মী-বৌটি হয়ে তুমি সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে। সেই আলো-মাখা মুখটাই মাঝে মাঝে আমার একাকীত্বের জীবনকে ভুলিয়ে রাখে। নয়তো এ বিদেশ-বিভুইয়ে, নিজের চারপাশে ব্যস্ততা জড়ো করে রাখা ছাড়া উপায় কি। এসবকে আবার অজুহাত বলে উড়িয়ে দিওনা যেন। বরং এই ভেবে আমাকে ক্ষমা করে দিও যে, মেইল না করে একখানা আস্ত চিঠি লেখার সময় বের করেছি, তাও আবার শুধু তোমার আব্দার রাখতে। আমি জানি মা, ওসব আধুনিক আদবকায়দায় তুমি ধাতস্থ হতে পারোনি, বা হয়তো চাওনি! হয়তো কেউ-ই আসলে চায় না, অথবা চায় কি চায় না বুঝে উঠতে পারেনা। যাক্ গে সেসব।

এবারে নাড়ু বানাওনি? বয়াম ভর্তি করে নাড়ু পাঠাবে নাকি আমার জন্য! সঙ্গে একটু তাজা খেজুরের গুড়ও পাঠিও না হয়। আহ্, লিখতে গিয়েই জিভে জল এসে গেল। হা হা হা! ঠিক ধরে ফেলেছো তো, ঠাট্টা করছি যে! সামনে থাকলে নিশ্চয়ই কান মুলে ধরে বলতে, 'ধিঙ্গি ছেলে, মশকরা হচ্ছে মায়ের সাথে!' তোমাকে কতদিন হাসতে দেখিনি মা। দোতলার ছাদের রোদ্দুরে লেপ-কম্বল বিছানো, রান্না করতে করতে শাড়িতে তেলচিটে হলদে ছোপ, দাদুর ইসি চেয়ারটা দখল করে থাকা পুষ্যি মেনিগুলো, বসার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো তোমার আর বাবার বিয়ের সেই সাদা-কালো ছবিটা, সবকিছুই তো কতদিন দেখিনি। কতদিন হল মা! ছ-বছর না তারও বেশি! কেঁদোনা গো। এবছর হয়তো ছুটি পাবো। 'হয়তো' শব্দটাই এখন আমার জীবন। বাবা তো আমার ফেরার অপেক্ষা করেনি, তুমি না হয় আর কটা দিন আমার ফেরার আশা নিয়েই বেঁচো! যেমনটা আমি বাঁচছি।

ভালোবাসা নিও মা। চিরকাল অবহেলা করে গেছো নিজের প্রতি, এখন অন্তত শরীরের যত্ন নিতে ভুলোনা। আমি কিন্তু দেখতে চাইনা তুমি একটুও বুড়ো হয়েছো এ ক'বছরে। আরও অনেককিছু লিখব ভেবেছিলাম, গুলিয়ে যাচ্ছে। শেষ করছি গো আজ। টাটা...

— তোমার অপু

বোধন

সমাদৃতা ঘোষ, চতুর্থ সেমিস্টার, ইংরেজী বিভাগ

সারা দিনের মুষলধারে বৃষ্টির পর গোটা রাস্তা জলমগ্ন । আকাশ চিরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে আর গুরু গম্ভীর শব্দে ঘন কালো মেঘ জানান দিচ্ছে, বর্ষণ আবার শুরু হলো বলে। অন্ধকার পথ। যে কটা গাড়ি যাওয়া আসা করে, আজ তাও নেই। ভাঙাচোরা বাড়িগুলো পুরনো কলকাতার স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে ভয় ভয় রাতের অন্ধকারে। কোথাও আলো নেই, রাস্তার বাতিস্তম্ভগুলো অনেকক্ষণ ধরে টিম টিম করতে করতে নিভে গেছে। গোটা শহর যেন আজ ভয়ে জড়োসড়ো, অজানা, অঘটনের আভাস পেয়ে আজ তারা ঘরে ঢুকে, বাইরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে, নিজেদের সুরক্ষিত আশ্রয়ে কান বন্ধ করে বসে আছে। ঝোড়ো হাওয়া দেয় আবার। রাস্তার ওপরে তিরপল দিয়ে আড়াল করা এক টুকরো জায়গাটায় জল ঢুকতে থাকে। ওটা মুরারীবাবুর কাজের জায়গা। আর মাত্র পাঁচ দিন, ঢাকে কাঠি পড়লো বলে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামে আবার।

রাস্তার পাশের ড্রেনগুলো উপছে ওঠে, আর জমা জলের সাথে ভেসে ওঠে একরাশ রক্ত। তিরপল ঘেরা জায়গাটা থেকে গোঙানি ওঠে। হাতড়ে হাতড়ে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে রক্ত মাখা অর্ধনগ্ন এক নারী দেহ। লম্বা চুলেগুলো জলে রক্তে ভিজে সেঁটে গিয়েছে দেহের সাথে। হামাগুড়ি দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে নেতিয়ে পড়ে সে। বৃষ্টি নামে আবার।

তিরপলের ভিতরে তখন অন্য দৃশ্য। রক্তে ভাসছে সে জায়গাটাও। আসুরিক শক্তি সম্পন্ন বিশাল দেহটা পড়ে আছে, সংজ্ঞাহীন হয়ে। একটা ছেনি ঢুকে গেছে তার দুপায়ের ফাঁকে, তার পৌরুষের ভিতরে। দানবীয় আহ্লাদে নারী দেহ ভক্ষণ করে যখন রাক্ষুসে উল্লাসে ফেটে পড়ছিল ওই দানব, তখন অর্ধ তৈরী দেবী মূর্তির পায়ের কাছে পড়ে থাকা ছেনিটা সর্ব শক্তিতে তুলে নিয়ে দুই পায়ের মাঝে পুরুষের অহংকারে বিঁধিয়ে দিতে লেগেছিল একটু সাহস।

এটা মুরারীবাবুর কাজের জায়গা। ছেনি, হাতুড়ি, কাঠ, খড়, মাটি পড়ে থাকা নতুন কিছু নয়। কাল তিনি আসবেন, দেবীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে তিনি মূর্তিটি শেষ করবেন। আজ মহালয়া... অসুর দমনের সূচনা হয়েছে।

‘‘পাহাড়ের রানী দার্জিলিং থেকে পাইনে মোড়া লামাহাটা’’ — এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা

রিয়াঙ্কা ব্যানার্জী, দ্বিতীয় সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

ঠিক নয় মাসের বন্দিদশা কাটিয়ে বেড়িয়ে পড়েছিলাম আমরা। করোনার বাড়াবাড়ির জন্য বেড়াতে যাওয়াকে বিরতি দিতে হয়েছিল। কিন্তু ভয় দ্বিধাকে সঙ্গী করেই ব্যাগ গুছিয়ে নিয়েছিলাম। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বেড়িয়ে পড়েছিলাম। করোনার কথা ভেবেই এমন জায়গা বেছে নিয়েছিলাম যেখানে অতিমারির দাপট কম। টিমে আমি, আমার মা, বাবা, জ্যেঠু, জ্যেঠি, দিদি। গন্তব্য হিমালয়ের পূর্বে ২০০০ মিটার, ৬৭০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ‘দার্জিলিং’। ‘দার্জিলিং’ এই জায়গাটির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। যা ‘চা’-এর জন্য সারা বিশ্বে বিখ্যাত। যার ডাকনাম ‘পাহাড়ের রাণী’। ‘পাহাড়ের রাণীর’ ইতিহাস ‘সিকিম’, ‘নেপাল’, ‘ব্রিটিশ ভারত’ এবং ‘ভুটানের’ ইতিহাসের সাথে জড়িত।

রাস্তায় একবার চা বিরতি নিয়ে পৌঁছতে সময় লাগল সাড়ে ৩ ঘন্টা। থাকার জন্য ‘সোনার বাংলা’ হোটেল বুক করা হয়েছিল। যাওয়ার পথে রাস্তার দুধারে প্রাকৃতিক ভাবে বেড়ে ওঠা ‘তারা গাঁদার’ অপরূপ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। হোটেল থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লাম ম্যালে। শীতের জায়গায় তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যায়। তাই ঠান্ডা আবহে তাড়াতাড়ি চলে আসলাম হোটেলে। পরদিন ভোরবেলায় বেরিয়ে পড়েছিলাম ‘সূর্য উদয়’-এর উদ্দেশ্যে ‘টাইগার হিল’-এ। এটা আমার দ্বিতীয়বারের প্রচেষ্টা ছিল। কারণ এর আগে প্রথম বারের প্রচেষ্টায় জল পড়ে গিয়েছিল। প্রকৃতির মাঝে মেঘের আড়াল দিয়ে উঁকি দিয়ে সূর্য নীল দিগন্তে চলে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম এবারও যদি দেখা না দেয়, কিন্তু প্রচন্ড ঠান্ডায় ধীরে ধীরে অন্ধকারময় প্রকৃতির রূপ আচ্ছন্ন হয়ে মেঘ সরে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা গেল। বরফে মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর রোদের আলো দেখে মনে হয়েছিল যেন প্রকৃতি তার হাত দিয়ে সোনার কুচি ছড়িয়ে দিয়েছে। কী অপরূপ তার দৃশ্য! যেন ছবিতে আঁকা রং-তুলির এক টান! কিছুক্ষণের অপেক্ষার পর সকাল ৬টা ১০ নাগাদ অন্ধকার সরে আলোর মধ্যে দিয়ে মেঘের অন্তরাল থেকে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্রবিন্দু থেকে উঠে আসল সেই সূর্য। যার সৌন্দর্য দেখার জন্য দূরদূরান্তর থেকে ভ্রমণকারীরা আসেন। ক্রমশ লাল সেই বিন্দু বড়ো হতে হতে হলুদ-এ যখন পরিণত হলো তখন আর চোখে দেখা যাচ্ছিল না। একদিকে বরফে মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্য দিকে সেই সূর্যোদয় দুইয়ে মিলে দেখে মনে হচ্ছিল যেন প্রকৃতির বুকে জলরঙে আঁকা এক ছবি। যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে তৈরি হচ্ছে কাঁচ দিয়ে ঘেরা গ্যালারী সূর্যোদয় দেখার জন্য। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে টেলিস্কোপ দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখলাম।

তারপর সেখান থেকে গাড়ি করে চলে আসলাম বাতাসিয়া লুপ। কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে হোটেলে এসে খাওয়াদাওয়া সেরে বেড়িয়ে পড়লাম পাইনে মোড়া ‘লামাহাটার’ উদ্দেশ্যে। দার্জিলিং থেকে যেতে ঘন্টাখানেক সময় লেগেছিল। লামহাটার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে ছোট মতন বাজার বসেছিল। তার শেষ সেই পাহাড়ের নীচে। তারপর লামাহাটা পৌঁছে টিকিট কাটা হল — সেই লামাহাটা ইকো পার্ক-এ ওঠার জন্য। যার উচ্চতা ৫,৭৯৯ ফিট। পায়ে হেঁটে উঠলাম। সেই পার্কের টিকিটের মধ্যে একটা ম্যাপও দেওয়া ছিল। তাই দেখেই উঠলাম। চারিদিকে অনেক ফুলের গাছ। একপাশ দিয়ে পাথরের

রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। পাহাড়টা জুড়ে রয়েছে পাইনে মোড়া সবুজ অরণ্য। মাঝে মাঝে বসার জায়গা করা আছে । যতই উপরে উঠছি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল চারপাশের সবুজের অপরূপ সৌন্দর্য। মনে হচ্ছিল ১৯২০-র সিনেমায় দেখা পাইনের ঘন জঙ্গল এর পরিবেশের মধ্যে ঢুকে গেছিলাম। চারিদিকে শান্ত পরিবেশ। মানুষের বেশি ভিড়ও ছিল না। মাঝে মধ্যে এক এক দিকে কুয়াশায় আবছা হয়ে যাচ্ছে। উপরে উঠে এক প্রাকৃতিক লেক যাকে পবিত্র লেকও বলে। এই লেক ব্যাঙে ভরা থাকে। এক অভিজ্ঞতা মনে হয়েছিল। কোনো মহাজাগতিক কিছু ছিল ওখানে মনে হয়েছিল সেদিন। একপাশে এক রাস্তা উঠে গিয়েছিল। সেখানে দেখলাম বিরাট বড়ো বড়ো পাথর। সেখানকার পরিবেশ ছিল শান্ত। চারদিক দিয়ে চলে গিয়েছিল বিভিন্ন রাস্তা পাইনের মধ্যে দিয়ে। কিছু জায়গায় সাদা, গোলাপি ফুলের গাছ ছিল। বড়ো পাথরের জায়গাটা জনমানব শূন্য ছিল। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

আস্তে আস্তে নীচে নেমে এসে গাড়ি করে আবার গেলাম দার্জিলিং-এ। পরদিন চিড়িয়াখানাতে গেলাম। সেখানে একজন গাইডকে নেওয়া হয়েছিল। তিনি সেখানকার মিউজিয়াম ও পশু পাখি দেখালেন। এবং সেখানে একটা প্রদর্শনী দেখলাম যা এভারেস্ট যাত্রার ওপর। পরদিন দুপুর থাকতে রওনা হলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। সেই রাণী থেকে পাইনে মোড়া লামাহাটাকে মনের ভিতর গেঁথে ফিরে এলাম। আমাদের ইঁট, কাঠ, পাথরে মোড়া জনজীবনের মধ্যে। তবে কথা দিয়ে এলাম, আবার যাব।

ধুলো

সমৃদ্ধা ঘোষ, চতুর্থ সেমিস্টার, ইংরেজী বিভাগ

তোমার সঙ্গে কথা নেই আর,
চুল ছাড়িয়ে দেব না
হলুদ চিরুনি দিয়ে।
চলে যাচ্ছি গোলাপি বিকেল
সাজিয়ে;
যেভাবে শরতের প্রতিমা
দিয়েছিলে সন্ধ্যার গাঙ্গে ভাসিয়ে।
সকাতরে ডাকিনি বাজারের মাঝে হারিয়ে গিয়ে
এই দোষ আমার —
ফর্দ বানিয়ে গেঁথে রাখা,
জানি।
রাখা থাকবে বলেই —
এ বিশ্বে আসা আমার, আসা তোমার।
দোষ ত্রুটি পেরেক দিয়ে গাঁথা আমাদের।

পলাতক তুমি নও,
রক্ত, মাংস, অশ্রু,
নরম ছাই ছাই মেঘ দিয়ে তৈরি তোমার শিলালিপি।

তুমি প্রতিবেশী —
সহশিল্পী —
আমার কাল্পনিক গ্রামের।
এই কাঁড়ি কাঁড়ি তর্ক,
কেজি কেজি এঁটো আক্ষেপ
বহন করে কোথায় যাবে ... আসমুদ্রহিমাচল ?
সেখানে আমি পৌঁছেছি গত গ্রীষ্মে।
সার শূন্য আমার উষ্ণতা —
একটা পলিথিনে বেঁধে দেবো,
মুখ ডুবিয়ে শ্বাস নিও।
নয়তো বা —
দম বন্ধ করে মেরে ফেলো
ওসব নরম মেঘের শিলালিপি।

তোমার সঙ্গে কথা নেই আর,
ঘরের দরজা বন্ধের পর
কোন অনুসন্ধান হবেনা।
মেঝেতে পড়তে থাকা ধুলো আমরা।
তীক্ষ্ণ সূর্যালোকে দেখতে পাবে শুধু...
ভেসে বেড়াই কেবলই।

এই বোধহয় ঘর ঝাড়তে এলে কেউ ভোররাতে।

কখনো ঘৃণা করিনি।
পরম ভালোবেসেছি...
আমরা পরম ভালোবাসি।
মানুষ, গাছ, মল্লিকা, কবিতা,
প্রযুক্তি, কুকুর বেড়াল, কাঠবেড়ালি,
সুর, তুলি, রক্ত, নাটক,
হাতে লেখা চিঠি, ই-মেল, অত্যাচার, আহ্লাদ।
যা পেরেছি ভালোবেসেছি।
মানুষ হতে গিয়েই
আমাদের এই পরম ভালোবাসা।
ঘৃণা করলে বরং রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম না।
এখন মনে হয় আমরা সব প্রতিমা; সুশ্রী, মৃত !

দেবীর বেদি

সমৃদ্ধা ঘোষ, চতুর্থ সেমিস্টার, ইংরেজী বিভাগ

দুই তিন ফালি দয়া,
খানিকটা গোলাপি সহিষ্ণুতা,
কোমল হাতের পরশ কপালে;
দিও একবার —
দেখবে এক পৃথিবী কুসুম দোপাটি
ঝরিয়ে দেবো কোলে তোমার,
আর পড়বে
একশ আট ফোটা তুমুল অশ্রুজল ।।
পোড়া দগদগে প্রাণী হয়ে এই আমি
পড়ে রইলাম —
দেবীর বেদিতে।

বিদ্যাসাগর ঃ দ্বিশতবর্ষ অতিক্রমকারী এক বিরল ব্যাক্তিত্ব

রিয়াঙ্কা ব্যানার্জী, দ্বিতীয় সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

যুগে যুগে বাংলার কোলে জন্ম নিয়েছেন বহু মহাপুরুষ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর শিক্ষা, জ্ঞান, সমাজের জন্য করে যাওয়া নানান কাজ আজও বাঙালি জাতির মেরুদন্ড সোজা করে রেখেছে।

প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্বের কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন —

''তিনি ছিলেন বৃহৎ জিনিসকে ক্ষুদ্র দেখাইবার যন্ত্র স্বরূপ।''

১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ভগবতী দেবী ও পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মনুষ্যত্বের মহৎ উত্তরাধিকার নিয়ে বিদ্যাসাগর-এর জন্ম হয়েছিল। তিনি বাংলাদেশের এক পরম বিস্ময়। শুধু বাংলাদেশ কেন, সমগ্র ভারতেই তাঁর কাজের প্রতি কৌতূহলের অভাব নেই। আজও, তাঁর জন্মের ২০০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও, তিনি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি উনিশ শতকের একক ব্যক্তিত্ব। সমাজ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, পাণ্ডিত্য, দয়াশীলতা ও সাহিত্য সৃষ্টি সব ক্ষেত্রেই তিনি অসামান্য। বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহু বিবাহ নিরোধের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, পাঠ্যপুস্তক রচনা ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা বাঙালির চিরকাল মনে থাকবে।

The Golden Book of Vidyasagar (1993) গ্রন্থটিতে কয়েকজন পাশ্চাত্য লেখক Ruby Maloni, William L Smith, Hilturd Rustau প্রমুখ লেখকেরা বিদ্যাসাগরের সমাজ ভাবনা ও সাহিত্য প্রতিভা নিয়ে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। এই ধরণের সংকলন গ্রন্থ প্রচুর রয়েছে। তারই মধ্যে এটি অন্যতম।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা জীবন শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায়। বীরসিংহ গ্রাম থেকে তাঁর বাবার সঙ্গে কলকাতায় আসেন (১৮২৮ সাল)। ১৮২৯ সালে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ। হিন্দু ল'কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৩৯ সাল)। সংস্কৃত কলেজে বারো বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়ন, 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ (১৮৪১ সাল)। একই বছরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগে প্রধান পণ্ডিত হয়েছিলেন। ১৮৪৯ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক (১৮৫০ সাল)। তাঁরই নেতৃত্বে ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্যান্যদেরও প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হল। ১৮৫৫ সালে অধ্যক্ষপদ সহ দক্ষিণবঙ্গ স্কুল ইন্সপেক্টর পদ লাভ করেন। একই বছরেই নর্ম্যাল স্কুল স্থাপন এবং নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুরে উনিশটি মডেল স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলার নির্বাচিত হন। ১৮৮০ সালে তিনি সি.আই.ই. উপাধি লাভ করেন। (তথ্যসূত্র ঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত)

আগে সংস্কৃত কলেজের ছুটি তিথি অনুসারে দেওয়া হতো। বিদ্যাসাগর এসে সাপ্তাহিকভাবে রবিবারকে ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করেন। ছাত্র এবং শিক্ষকদের অনুপস্থিতি হলে তাও লিখে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি — 'বিধবাবিবাহ প্রচলন'। সেইসময় খুব কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হ'তো, পুরুষের বয়সের কোনো বিচার ছিল না, এবং তার সাথে প্রচলন ছিল বহুবিবাহ। তাই একজন পুরুষের মৃত্যুতে বহু অল্প বযসের মেয়েরা বিধবা হতো। নারী জাতির দুঃখে তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। বিধবাবিবাহ প্রচলন করার উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করলেন। চারদিকে প্রবল বাঁধায় তাঁর প্রাণসংশয় পর্যন্ত দেখা দিয়েছিল। তবে এই সমস্ত বাধা তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। ১৮৫৬ সালের ১৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন কার্যকর হয়। পুরুষের বহু বিবাহ ও বাল্যবিবাহের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এই মহান ব্যক্তিত্ব তাঁর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালী সমাজে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় হিউম্যানিস্ট ও হিতবাদীদের মতো তিনি সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে পুঁথিগত করে রাখেননি। তাকে কর্মের কঠিন উদ্যোগে সার্থক করতে চেয়েছেন।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের নির্মাণ করেছেন। তাঁর রচনাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় — (১) অনুবাদ মূলক রচনা (২) শিক্ষামূলক রচনা (৩) সমাজ সংস্কারকমূলক রচনা (৪) মৌলিক রচনা (৫) ছদ্মনামে রচনা

১) **অনুবাদমূলক রচনা ঃ** তাঁর প্রথম মুদ্রিত অনুবাদ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) (এর আগে তিনি 'বাসুদেব চরিত' অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গেলেও গ্রন্থটি পাওয়া যায়নি।) 'বৈতাল পচ্চিসী' নামে হিন্দী পুস্তকের অনুবাদ। পণ্ডিতদের মতে বেতালের প্রতিষ্ঠা সোমদেবের কথা সরিৎসাগরের উপর। বেতালের সংস্কৃত পুঁথিতে তিনজন রচনাকারের নাম পাওয়া যায় — 'শিবদাস ভট্ট', 'জম্বল দত্ত', 'বল্লভ দাস'। আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেও বেতালের নানা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' সারা বাংলা দেশেই জনপ্রিয় গল্পগ্রন্থরূপে প্রচারিত হয়। ১৮৫৪ সালে বিদ্যাসাগরের অনুবাদ 'শকুন্তলা' প্রকাশিত হয়। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের গদ্য অনুবাদ এই গ্রন্থ। ১৮৬০ সালে 'সীতার বনবাস' প্রকাশিত হলে বাংলা গদ্যের ক্লাসিক ও লিরিক একত্রে মিলিত হল। ভবভূতির উত্তর রামচরিত ও বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে লেখা সীতার বনবাস। এছাড়া মহাভারতের উপক্রমণিকা (১৮৬০ সাল)। শেক্সপীয়র তাঁর অতি প্রিয় লেখক ছিলেন। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাতো তিনি তাদের শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী উপহার দিতেন। শেক্সপীয়রের প্রতি তাঁর আকর্ষণের প্রমাণ — ''ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯ সাল)। এটি শেক্সপীয়রের 'The Comedy of Errors'-এর অনুবাদ। ইংরাজী নাটক থেকে বাংলা গদ্য কাহিনীতে রূপান্তরিত করা একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাজ। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই কাজটি করেছিলেন।

ইংরাজী থেকে নীতি উপদেশমূলক গ্রন্থ অনুবাদ ঃ

বাংলার ইতিহাস (১৮৪৮) মার্শম্যানের History of Bengal, জীবনচরিত (১৮৪৯) চেম্বার্সের Rudiments of Knowledge ও কথামালা (১৮৫৫) ঈশপের ফেবলসের অনুবাদ।

২। **শিক্ষামূলক রচনা ঃ** উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ — বর্ণপরিচয় (১৮৫৫), এই বইটি প্রত্যেক বাঙালি শিশুর অক্ষর জ্ঞানের প্রথম বই। এই বইটির বহু সংস্করণ হয়েছে। আজও সমানভাবে বাঙালীর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বর্ণপরিচয়। 'ঋজুপাঠ' (১৮৫১-৫২), সংস্কৃত ব্যাকরণ — উপক্রমণিকা (১৮৫১) ও ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৩) তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লেখা।

৩। **সমাজসংস্কারমূলক রচনা ঃ** বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এত্বদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এত্বদ্বিষয়ক বিচার (১৮৭১) এই দুটি গ্রন্থে অত্যন্ত যুক্তির সঙ্গে তিনি তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৪। **মৌলিক রচনা ঃ** প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৬৪, প্রকাশিত ১৮৯২), বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশুকন্যা প্রভাবতীর মৃত্যুতে লেখা। এটিকে বাংলা সাহিত্যের শোকগাথা বলা যেতে পারে।

৫। **ছদ্মনামে রচনা ঃ** বিদ্যাসাগর ছদ্মনামেও বই লিখেছিলেন। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য ছদ্মনামে তিনি লিখলেন অতি অল্প হইল (১৮৭৩), আবার অতি অল্প ইহল (১৮৭৩), ব্রজবিলাস (১৮৮৪)। এবং কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য নামে 'রত্নপরীক্ষা' লিখেছিলেন। কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণ ঃ ছদ্মনামে 'বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা' প্রকাশিত হয়। সমালোচকের মতে ''এরূপ উচ্চঅঙ্গের রসিকতা বাংলা ভাষায় অল্পই আছে''।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক ছিলেন। বাংলা ভাষাকে তিনি সজীব ও সচেতন করেছেন। মৌলিক রচনার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদও করেছিলেন। তাঁর অনুবাদের মাধ্যমে একদিকে প্রাচীন সাহিত্য ও অন্যদিকে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রচনার সঙ্গে পরিচিত হল পাঠক। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন । মৌলিক প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তিনি অনুবাদের ওপর জোর দিয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন অনুবাদ ভাষার ধারণ ও বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তিনি হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরাজী থেকে অনুবাদ করেছিলেন। তিনি আক্ষরিক অনুবাদ করেননি, ভাবানুবাদ ও রসানুবাদ করেছিলেন। মৌলিক প্রবন্ধ রচনার ক্ষত্রেও বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়ক তাঁর রচনা অত্যন্ত তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ। সামাজিক দিক থেকে এই গ্রন্থগুলির মূল্য অপরিসীম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন — ''বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী।'' তিনি বাংলা গদ্যে শ্রী দান ও লাবণ্য সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর ভাষা ঋজু ও প্রাঞ্জল । সংস্কৃত প্রধান ও সন্ধি সমাস যুক্ত শব্দ থাকলেও তাঁর ভাষা গতিময়। আবেগের স্পর্শ তাঁর ভাষায় লক্ষ্য করা যায়। ছেদ ও যতি চিহ্নের ব্যবহার বাংলাভাষায় তিনিই প্রথম সঠিকভাবে দেখালেন। যাকে বলা হয় ''The Other Harmony of Prose''। 'ভ্রান্তিবিলাস' অনুবাদে তিনি মূল ইংরাজী থেকে কাহিনী চরিত্রগুলির ভারতীয়করণ করেছিলেন।

তাঁর আত্মজীবনীমূলক অসমাপ্ত রচনার নাম 'বিদ্যাসাগর চরিত'। এটি সমাপ্ত হলে উনিশ শতকের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হতে পারত। এই গ্রন্থেই বীরসিংহ থেকে পিতার সাথে কলকাতায় আসার পথে মাইলস্টোন দেখে বালক বিদ্যাসাগরের ইংরাজী অঙ্ক চেনার সরস গল্পটি আছে।

তিনি ছিলেন উনিশ শতকের এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। বাংলার সমাজ সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা ও সার্বিকভাবে শিক্ষা প্রসার, স্কুল-কলেজ স্থাপন ও বাংলা গদ্যে তাঁর অসামান্য দান। তবে সবার উপরে ছিল তাঁর মানবতা, যা প্রকৃত অর্থেই তাঁর স্বধর্ম।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

- অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'
- গোপাল হালদার রচিত 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা'
- ভূদেব চৌধুরী রচিত 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'।

ফেলুদার সঙ্গে বোলপুরে

দেবলীনা দাশগুপ্ত, প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

বারো বছরের রিক্তা কোনোদিনও কোলকাতার বাইরে বেরোয়নি। ওর বাড়ি গড়ফার লক্ষ্মণ কুটিরে, স্কুল গড়ফার ঝিল রোডে, খেলতে যায় গড়ফা মিলন সংঘ ক্লাবের মাঠে। রিক্তার বাবা, রণজয় মজুমদারের একটা বইয়ের দোকান আছে বইপাড়ায়। ওর মা, রঞ্জিতা মজুমদার একজন সঙ্গীতশিল্পী, বাড়ির একতলায় ওঁর গানের স্কুলও আছে। রিক্তাও, ওর মায়ের কাছে গান শেখে। পড়াশোনা, খেলাধুলো, গান আর মাঝে মাঝে টিভিতে কার্টুন দেখা, এই নিয়েই থাকে রিক্তা । মোবাইলে হাত দেওয়া রঞ্জিতা একদম পছন্দ করেন না, তাই সেটা নেওয়ার সাহস হয় না রিক্তার। ইচ্ছেটাকে মনের মধ্যেই চেপে রাখে।

সচ্ছল পরিবার হলেও আজ পর্যন্ত রিক্তার মা বাবা ওকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে পারেননি। তার কারণ রিক্তার ঠাকুমা খুবই অসুস্থ। রিক্তার যখন এক বছর বয়স, তখন ওর ঠাকুমা সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে একেবারে পঙ্গু হয়ে যান। তাই ঠাকুমাকে ফেলে রিক্তাদের দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়ে ওঠে না। যদিও রিক্তার ঠাকুমাকে দেখাশোনা করার জন্য একজন ভদ্রমহিলা আছেন, তবুও রঞ্জিতা নিজের অসুস্থ শাশুড়ির দেখাশোনা ঠিকমত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন।

রিক্তাদের আত্মীয়স্বজনও সকলেই কোলকাতাতেই থাকেন । মাঝে মাঝে রিক্তা ওর বাবা মায়ের সঙ্গে তাঁদের বাড়ি যায় ঠিকই, কিন্তু রঞ্জিতা বেশিক্ষণ থাকতে চান না। একজন অসুস্থ অসহায় বৃদ্ধাকে শুধুমাত্র একজন পরিচারিকার ভরসায় ফাঁকা বাড়িতে রাখতে চান না রঞ্জিতা । তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসেন ।

এভবেই দিন কাটছে ওদের ।

রিক্তার স্কুলের বন্ধুরা বাবা মায়ের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যায়। রিক্তারও খুব ইচ্ছে করে বেড়াতে যেতে, কিন্তু ও নিজেও জানে যে বাবা মায়ের পক্ষে সম্ভব নয়। আর ওরও ঠাকুমাকে দেখলে বড়ো মায়া হয়। ও বোঝে সবটাই।

রিক্তা একবার ওর মাকে বলেছিল, ''মা, জানো স্নিগ্ধারা নৈনিতাল বেড়াতে যাচ্ছে''।

রিক্তার কথা শুনে রঞ্জিতা শুকনো মুখে রণজয়ের দিকে তাকিয়েছিল শুধু। রিক্তা ওর সামান্য বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিল যে ওর মা বাবা এই বিষয়ে ভীষণই অসহায় । তারপর থেকে ও আর বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেনি কখনও।

তবে রিক্তার এখন অবসর সময়ের নতুন সঙ্গী হয়েছে । বই ব্যবসায়ী রণজয় নিজেও একজন বইপোকা, এমনকি রঞ্জিতাও বই পড়তে ভীষণ ভালবাসেন। বাড়ির দোতলায় একটা ছোট বইঘর আছে। রিক্তা মাঝে মাঝে সেই ঘরে গিয়ে বইপত্র ঘাঁটে ঠিকই, কিন্তু মনোযোগ সহকারে বই পড়া এখনও শুরু করেনি। তাই রণজয় রিক্তাকে বেশ কয়েকটা বই বের করে দিয়ে পড়তে বলেছেন। রিক্তা ওর পড়া, খেলা, গান শেখার ফাঁকে এখন মন দিয়ে বই পড়তে শুরু করেছে। আর সত্যি বলতে কী বই পড়তে বেশ ভাল লাগছে ওর। শান্তনু বসুর 'ঘটোৎকচ ভ্যানিশ' বইটা পড়ে ও দারুণ মজা পেয়েছে। কী ভাল লেগেছে বইটা! তারপর থেকে বইয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছে ওর। এখন 'নসিবপুরের ভূত' শেষ করে ও 'ফেলুদা সমগ্র' হাতে নিয়েছে। যদিও 'সোনার কেল্লা' আর 'জয় বাবা ফেলুনাথ' দুটো সিনেমাই ওর দেখা । এবার ছাপার অক্ষরে ফেলুদা পড়া শুরু করবে ও ।

'ফেলুদা সমগ্র' বইটার সূচিপত্রে চোখ বুলোতে বুলোতে একটা নামে এসে ওর আঙুল আটকে গেল। 'রবার্টসনের রুবি'। বাঃ, গল্পটার নামটা বেশ সুন্দর তো ! এটা দিয়েই তাহলে শুরু করা যাক ফেলুদা কাহিনী পাঠ।

রিক্তা পড়তে শুরু করল রবার্টসনের রুবি। বীরভূম জেলার পটভূমিকায় লেখা এই কাহিনী। কী অসামান্য লেখনী! কী অসাধারণ বর্ণনা করার ক্ষমতা! এ যেন কলমে নয়, তুলি দিয়ে লেখা। সব ঘটনা, প্রতিটি জায়গা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। পড়তে পড়তে রিক্তার মনে হচ্ছিল ও যেন গল্পের সেই জায়গায় পৌঁছে গেছে আর সবকিছু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে।

গল্পটা শুরুই হয়েছে বীরভূম জেলায় বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা দিয়ে। ফেলুদা লালমোহনবাবুকে বীরভূম জেলা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য দেওয়ার ফলে লালমোহনবাবুর বীরভূম জেলা দেখার ইচ্ছে হয়; ইচ্ছে হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন দেখার। সেই ইচ্ছে অনুযায়ী শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে করে সকলে বোলপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। এখানে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের লাউঞ্জ কারের বর্ণনাটিও অসাধারণ। রিক্তার মনে হল, ও নিজেও যেন ফেলুদা, লালমোহনবাবু আর তোপসের সঙ্গে লাউঞ্জ কারের একটা সোফায় বসে বোলপুর যাচ্ছে।

ট্রেনেই ফেলুদাদের সঙ্গে আলাপ হয় পিটার বরার্টসনের, যার একটা দামি পাথরকে নিয়েই রহস্য তৈরি হয়েছে এই গল্পে।

বোলপুর পৌঁছে ফেলুদারা উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সে যায়। উত্তরায়ণ দেখে পিটার রবার্টসন বলে, ''ইট লুকস্ লাইক এ ফেয়ারি টেল প্যালেস''। সঙ্গে সঙ্গে রিক্তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাজপ্রাসাদের মত উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সের ছবি।

ফেলুদাদের বোলপুর ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল রবার্টসনের রুবি নিয়ে নানান ঘটনা। এই রুবিকে কেন্দ্র করেই তৈরি হতে লাগল রহস্যের বেড়াজাল। গল্পের প্রয়োজনে এল বিভিন্ন চরিত্র, যাদের চেহারা আর চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রিক্তাকে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। রিক্তা যেন মনশ্চক্ষু দিয়ে তাদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছে।

বোলপুরে ভ্রমণের পরিকল্পনা করার সময়েই ফেলুদা দুবরাজপুরের মামা-ভাগ্‌নে পাহাড়ের কথা বলেছিল । সেই পাহাড় তারা সদলবলে দেখতে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। পাহাড়ের বর্ণনা মুগ্ধ করল রিক্তাকেও। পড়তে পড়তে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল ''এক বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে ছোট বড় মাঝারি সাইজের পাথর কাত হয়ে পড়ে আছে না হয় খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে যেগুলোর হাইট সত্যিই উঁচু সেগুলো প্রায় তিন তলা বাড়ির সমান''। এই পাহাড়েরই এক বিশেষ জোড়া পাথরকে বলা হয় মামা-ভাগ্‌নে। একটা বিরাট চ্যাপ্টা পাথরের ওপর আরেকটা বিরাট পাথর। একেই বলে মামার পিঠে ভাগ্‌নে। এই মামা-ভাগ্‌নে পাহাড় সম্পর্কে যে প্রচলিত দুটি কিংবদন্তি রয়েছে তাও রিক্তা জানতে পারল। পড়তে পড়তে ওর মনে হল একটা মানুষ কত পরিশ্রম করেছেন, কত পড়াশোনা করেছেন একটা রহস্যকাহিনী লেখার জন্য। আর কী সুন্দর লেখার ধরণ! রিক্তা ওর স্কুলের বাংলা বিষয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতি সুমিত্রা রায়ের কাছে শুনেছে যে লেখকের লেখার ধরণকে বলা হয় রচনাশৈলী। সেক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের রচনাশৈলীর কোনো তুলনাই হয় না।

মামা-ভাগ্‌নের পর রঘু ডাকাতের শ্মশানকালীর মন্দির আর পাহাড়েশ্বর শিবের মন্দিরের কথা রয়েছে। সেইসঙ্গে দুবরাজপুর থেকে দু'মাইলের মধ্যে হেতমপুর বলে একটি জায়গার কথাও গল্পে আছে। এই হেতমপুরেই রয়েছে টেরাকোটা মন্দির, যার গায়ে দুশো বছরের পুরোনো থামে মেমসাহেবের মূর্তি আছে।

বোলপুরের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই একটু একটু করে তৈরি হচ্ছে রহস্যের ঘন কুয়াশা। ফেলুদা, তোপসে আর লালমোহনবাবু যেন সবসময়ই তৈরি রয়েছে যে কোনো রহস্য আর বিপদের মোকাবিলা করার জন্য।

অবশেষে সেই রহস্য একেবারে চরম পর্যায়ে পৌঁছল ফুলবেড়িয়ায় সাঁওতাল নাচের দিন। গল্পের এই অংশে সাঁওতাল নাচের এক অপূর্ব আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে। সাঁওতাল গ্রামের একটা মাঠে চারিদিকে মশাল জ্বলছে। একপাশে সাঁওতাল মেয়েরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আরেকপাশে মাদল আর বাঁশি নিয়ে সাঁওতালি পুরুষরাও তৈরি। তারপর মাদলে চাঁটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল নাচ। রিক্তার মনে হল ও যেন সেই মাদলের শব্দ নিজের কানে শুনছে পাচ্ছে, নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে সাঁওতাল মেয়েরা একে অপরের হাত ধরে দুলে দুলে সেই মাদলে আর বাঁশির তালে তাল মিলিয়ে নাচছে। অপূর্ব সে দৃশ্য!

বইতে কয়েকটি ঘটনার স্কেচ দেওয়া রয়েছে বলে রিক্তার বিষয়গুলো কল্পনা করতে আরও বেশি সুবিধা হচ্ছে।

সাঁওতাল নৃত্যের পরই রহস্য আরও জটিল হয়ে উঠল, এবং ক্রমশ সেই রহস্যের সমাধানও ঘটল।

গল্পটা শেষ করে রিক্তা একছুটে ওর মায়ের কাছে গিয়ে রঞ্জিতার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, ''মা, আমি ফেলুদার সঙ্গে বোলপুরে ঘুরে এলাম গো''।

রঞ্জিতা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''মানে? কী বলছিস রে''?

রিক্তা হেসে বলল, ''হ্যাঁ গো মা, আমি বোলপুরে ঘুরে এলাম। রবার্টসনের রুবি পড়ে আমি সবকিছু দেখে ফেললাম''।

রঞ্জিতা এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, কারণ উনি নিজেও একজন বইপোকা। মেয়ের কথা শুনে হেসে বললেন, ''তাহলে তো তোর বোলপুরের অনেক কিছুই দেখা হয়ে গেল। জানিস, লেখক অতনু প্রজ্ঞানের লেখা একটা উপন্যাস আছে, ''আমি আশাবরী''। এই উপন্যাসের একটা অংশে একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে লেখক কয়েকটা কথা বলিয়েছেন, যে কথাগুলো আমার খুব ভাল লেগেছিল''।

''কী কথা মা''? রিক্তা খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

রঞ্জিতা বললেন, ''এই উপন্যাসে সঞ্জয় নামে একটি চরিত্র আছে। উপন্যাসের একটা অংশে একটা সেমিনারের কথা বলা হয়েছে। সেখানে ছোটদের সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সঞ্জয় বলেছেন, ''আমরা প্রত্যেকেই একটা করে ভিডিও ক্যামেরা মাথার ভেতর নিয়ে জন্মাই... 'তাই যখনই আমরা কোনো গল্প পড়ি তখন আমরা পুরো গল্পটা ওই ক্যামেরার চোখ দিয়েই দেখতে পাই। এটা একটা অদৃশ্য ক্যামেরা। আর এই ক্যামেরাটাই হল কল্পনা করার ক্ষমতা''।

রিক্তা মায়ের কথা শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ''তাহলে আমিও কি গল্পটা পড়ার সময়ে ওই ক্যামেরার সাহায্যেই ফেলুদার সঙ্গে বোলপুর ঘুরে এলাম?''

রঞ্জিতা হেসে বললেন, ''ঠিক তাই, সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ বর্ণনা, অসামান্য রচনাশৈলী আর তোর কল্পনাশক্তি তোকে সাহায্য করেছে কোলকাতায় বসেই বোলপুরে ঘুরে আসতে''।

মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে রিক্তা নিজের ঘরে এসে স্কুলের কিছু পড়াশোনার কাজ শেষ করল। তারপর রাতের খাওয়াদাওয়ার পর আবার ফেলুদার বইটা হাতে নিয়ে সূচিপত্রের পাতাটা খুলল। একের পর এক গল্পের নামগুলো দেখতে দেখতে একটি জায়গায় এসে রিক্তার আঙুল আবার থেমে গেল। মুখে একচিলতে হাসি ফুটে উঠল ওর। মনের আনন্দে ৫৬৭ নম্বর পৃষ্ঠা খুলে ও পড়তে আরম্ভ করে দিল। ও এখন ফেলুদার সঙ্গে লণ্ডনে বেড়াতে যাবে...

প্রিয় কথক — সদত হসন মান্টো

দিশারী মুখার্জী, অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সময়টা কি সত্যিই অসহনীয় ???

নাকি সহ্য করে নিতে পারছি আমরা !

বেঁচে থাকার গল্পগুলো নীল, লাল, হলুদ ঝলমলে রঙের মোরক থেকে বেরিয়ে আসে ভয় পাই, লজ্জা পাই, বেআব্রু জীবনের সাথে চোখাচোখি হলেই মুখ ঘুরিয়ে ফেলি, ফেলে দিতেও দ্বিধা করিনা দগদগে ক্ষত।

কেনো দেখবো ?

কেনো রাখবো যন্ত্রণার সাথে নিবিড়তা !

তবু খোদা তো এই গল্পই নির্মাণ করেছেন।

চাই বা না চাই, আমরা সেই গল্পেরই চরিত্র। স্বচ্ছতা আগলে, আড়াল করে রাখি অন্ধকূপ।

এই নির্মাণ শিল্পে খোদাকেই একমাত্র প্রতিদ্বন্দী ভেবেছেন সদত হসন মন্টো। তিনি লিখেছেন — "যে সময়ে আমরা বেঁচে আছি, তার সঙ্গে যদি আপনার পরিচয় না থাকে, তার গল্পগুলো পড়ুন। আপনি যদি তার গল্পকে সহ্য না করতে পারেন, তবে বুঝবেন, এই সময়টাই অসহনীয়।"

সদত হসন আর মেন্টো একই শরীরের রুবারু দুই রুখ...

পূর্বপুরুষা ছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিত, ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে পাঞ্জাবে চলে আসে সপরিবারে। মান্টো নামের মান্ট শব্দের অর্থ কাশ্মীরি ভাষায় ওজন পরিমাপক, তবে কি সেই থেকে মন্টো! নামের উৎস জানতে জহরলাল নেহেরুকে অবধি চিঠি লিখেছিলেন। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য মান্টো শব্দের আভিধানিকভাবে অর্থ পূর্ণতাকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু জীবনের ভাষা কোথায় পূর্ণতা পায়? নৈশব্দের মানে অভিধান বলে দিয়েছে কখনো আমাদের ?

আমরা তো সব ক্ষত প্রাণপনে দূরে সরিয়ে যা কিছু আনন্দ সেইসব জামা কাপড় শরীরে গলিয়ে নিই। এত এঁটে থাকে এই কাপড় যে নিজেদেরই ঘাম, পুঁজ অবধি দেখতে লজ্জা পাই। যাপন গল্পের গোল চাকার অর্ধেকটাই ভীষণ ভালোবাসার অপূর্ণতাকেই দেখতে চাই, শুনতে চাই। খোদার বানানো গোল চাকার আলোর ভাগটুকু একমাত্র ভোগ করতে চাই।

আর তিনি, বারবার বাকি অর্ধেক চাকার কিসসা শুনিয়েছেন। দারিদ্র্যের প্রকটতা জড়িয়ে নিজের নামের সাথে মেলাতে চেয়েছেন পূর্বপুরুষদের ঐশ্বর্য, বৈভব। তার কাশ্মীরি পূর্বপুরুষরা শস্য মাপার জন্য ব্যবহার করতেন সোনার বাটখারা। সংকট যাকে কখনো স্থির হতে দেয়নি, তার নামের উৎসে সত্যি এই স্বর্ণ মায়া !!

তবে সদত হসন... তার শিকড় কোথায় !!

ইতিহাস ''সদত হসন'' জাতির সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত তথ্য দিতে পারেনা। মান্টোরও উৎসাহ ছিলনা ইতিহাসের মনে না থাকা এই উৎসের অনুসন্ধানে। আচ্ছা তবে কি জানতেন 'মান্টো' বেঁচে থাকবে দেশভাগের ইতিহাসে, জীবনের নিষিদ্ধ অলিগলি কুড়োতে কুড়োতে বুনতে থাকা গল্পে !

তাই কি আগ্রহ নিয়ে খুঁজেছেন মান্টো শব্দের ইতিহাস !

তিনি উর্দু সাহিত্যের ঘরের মানুষ, অথচ এই ঘরেই তিনি ঢুকতে পারেননি প্রথাগত পরিসর দিয়ে। তিনবারের চেষ্টায়, তৃতীয় বিভাগে কোনমতে পাস করেছিলেন ম্যাট্রিকুলেশন। সবেতে কোনোমতেই উত্তীর্ণ হলেও একমাত্র উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে পাশ নম্বরটুকু জোটাতে পারেননি।

ভবঘুরের যাপন তাকে আনন্দ দিত, যা কিছু নিষিদ্ধ, তাকে টানত।

এভাবেই অমৃতসরের রাস্তায় রাস্তায়, গোরস্থানে, ফকিরের ডেরায়, মার্গ সঙ্গীতের আশ্রমে, আজিজের হোটেলে অস্থির দিন রাত্তির কাটিয়ে ফেলা। যা কিছু সমাজিক ট্যাবুর বিপরীতে তিনি সেই পথেই হেঁটেছেন। এই বিপরীত পথ ধরেই মূল স্রোতের নাবিকদের কখনো দিক চিনিয়েছেন, কখনো ভ্রান্ত করেছেন ।

আজিজের হোটেলেই পরিচয় হয় তার সাথে ''বারি আলিগ'' সাহেবের সাথে।

এই সঙ্গ তাকে পৌঁছে দিয়েছিল ভিক্টর হুগো, গোর্কি, চেখভ, মপাসাঁ, অস্কার ওয়াইল্ডের দরবারে । জীবনের এক মোড় থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন অন্য মোড়ে।

উর্দুতে মান্টো অনুবাদ করেন হুগোর উপন্যাস, গোর্কির গল্প, ওয়াইল্ডের নাটক ।

রচনা করেন ''তামাসা''।

বারি আলিগ সাহেবের সাপ্তাহিক পত্রিকা খুলুক-এ প্রকাশিত হয়।

মান্টোর প্রথম ছোটগল্প তামাসা। সেই থেকে চালু হয় গল্পকারের কলম।

এরপর থেকে তাঁর প্রচুর যাতায়াত তৈরী হয়েছে পাঠকের সাথে। দশ টাকা, আমার নাম রাধা, গন্ধ, কালো শালোয়ার, শরিফন, ঠান্ডা গোস্ত এরকম অজস্র গল্পের নামের ভিতর । উর্দু থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে সেই গল্প। তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন কিসসা বলার প্রয়াসকে, ক্ষত থেকে জন্ম দিয়েছেন গল্পের । ধ্বসংস্তূপের ভিতর থেকে নির্মাণ করেন চরিত্রদের। সাধারণত সাহিত্য যেই অন্ধকার থেকে দূরে থাকে, মান্টো সেই দূরত্বকে মিশিয়ে দিয়েছেন, দিতে চেয়েছেন পাঠকের সাথে । 'আমার পাঠকের প্রতি' প্রবন্ধে তিনি প্রচলিত রীতি-নীতির বাইরে গিয়ে সরাসরি কথা বলতে চাইছেন পাঠকের সাথে। উঠে আসছে পাঠকের কাছে কল্পকাহিনী বলতে চাওয়ার আবেগ কারণ সেটাই তার একমাত্র পছন্দের মাধ্যম।

১৯১২, ১১ই মে থেকে ২০২১, ১১ই মে দীর্ঘ তাঁর জন্মদিন। জন্মের শতবর্ষের ক্লান্তি আর দৈর্ঘ্য পাঠক মনে রাখে, রাখবে। আর প্রতিটি গল্পেই প্রায় থেকে গেছে কথকের সেই অসংযত চোখাচোখি ! !

আমরা গিলে ফেলি ? কষ্ট পাই ? নাকি সাহস পাই ?

প্রিয় কথক বেঁচে আছেন, এখনো সেই কৌতূহল নিয়েই।

কে বড় গল্পকার ? খোদা না মান্টো ?

পঞ্চাশেও প্রাসঙ্গিক ঃ অপ্রতিদ্বন্দ্বিত প্রতিদ্বন্দ্বী

দেবলীনা গুহ ঠাকুরতা, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

সম্প্রতি আইরিশ কবি ডব্লু. বি. ইয়েটসের কিছু লেখা পড়তে গিয়ে নজরে পড়ল একটি লাইন যেটি কবি তাঁর 'দ্য সিক্রেট রোজ'-এর এপিগ্রাফ হিসাবে ব্যবহার করেছেন — ''As for living, our servants will do that for us.'' Villiers de L'Isle Adam-এর ১৮৯০ সালে প্রকাশিত ফরাসি নাটক Axel-এর এর একটি সাড়াজাগানো লাইন যা জীবনযাপনের বাস্তবতা, যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমাদের ভাবায়। এই শতকে দাঁড়িয়ে এই উক্তি যেন আরও প্রাসঙ্গিক। যেখানে একদল মানুষকে ইতিহাস প্রায় মুছেই দিতে চাইছে, বিশেষ করে আজকের অতিমারী পরিস্থিতিতে, সেখানে আর কি চিৎকার করে বলতে পারছি আমরা — ''প্রাণ আছে, এখনও প্রাণ আছে'' ? (ছন্নছাড়া, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত)

পাঠকবৃন্দের মনে হতে পারে, এই প্রবন্ধ হয়তো সমাজের অচলায়তনের কথা বলবে। কতকটা ঠিকই। আসলে শতবর্ষে সত্যজিৎ নিয়ে লিখতে গেলে সমাজ, সমাজব্যবস্থা এবং মানবজীবন উঠে আসবেই। তাঁর কর্মকাণ্ডের বিস্তার এই স্বল্প পরিসরে ধরা সম্ভব নয়। তাই এই আলোচনাকে সীমিত করছি ১৯৭১-এ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। ২০২১-এও যখন আবার ছবিটি দেখলাম তখন নতুন করে মানুষের অস্তিত্ববাদের সঙ্কট (existential crisis) আরও বেশি করে ভাবিয়ে তুলল। সিদ্ধার্থর একাকীত্ব, ষাটের দশকের কলকাতা, রাজনৈতিক সঙ্কট এবং তৎকালীন ভিয়েতনাম যুদ্ধ — ছবির প্রেক্ষাপট এটাই। ছবির গোড়াতেই সিদ্ধার্থর অকপট উত্তর এবং সমাজতান্ত্রিক মানসিকতা তার পেশাগত জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের পড়া ছেড়ে তাকে বেরিয়ে পড়তে হয় জীবিকার খোঁজে। একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাধারণ মানুষের এই সত্ত্বাভিত্তিক লড়াই, সে সময়কার মেট্রোপলিটান, বর্ধিষ্ণু কলকাতা এবং তার শ্রেণীগত বিভাজনভিত্তিক অবস্থান — এটাই প্রতিদ্বন্দ্বীর যাত্রাপথ।

সত্যজিৎ রায়ের কলকাতা-কেন্দ্রিক ছবিগুলির মধ্যে একটি হল 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। সত্যজিৎ তাঁর কেন্দ্রীয় চরিত্র সিদ্ধার্থকে বারবারই ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ফেলে আসা অতীতে। ছবির শুরুতে সত্যজিৎ সিদ্ধার্থর পিতৃবিয়োগের দৃশ্যে ব্যবহার করেছেন নেগেটিভ শট। যা স্পষ্টতই সিদ্ধার্থর জীবনের নেতিবাচক যাপনকে তুলে ধরে। ছবির শেষের দিকে একটি লম্বা করিডরের কোনায় দাঁড়িয়ে থাকা সিদ্ধার্থর চোখে পড়ে কতগুলি কঙ্কালসার মানুষ ঘর্মাক্ত, পরিশ্রান্ত এবং জীবনযুদ্ধে প্রায় পরাস্ত যারা চাকরির আশায় বসে আছে। গোটা ছবিতেই এই কঙ্কালের অবয়ব ফিরে আসে বারবার, যেখানে মানুষের পরিচয় শুধু তার কাঠামোয় — নিজস্বতাবিহীন সত্ত্বাবিহীন এক অস্তিত্ব। মনে পড়ে 'ছন্নছাড়া' কবিতার সেই অবিস্মরণীয় লাইন, ''গলির মোড়ে একটা গাছ দাঁড়িয়ে / গাছ না গাছের প্রেতচ্ছায়া... / আঁকাবাঁকা শুকনো কতকগুলি কাঠির কঙ্কাল / শূন্যের দিকে এলোমেলো তুলে দেওয়া, / রুক্ষ, রুষ্ট, রিক্ত, জীর্ণ...।'' শহুরে আদবকায়দা এবং তার বীভৎসতা, মধ্যবিত্ত অবস্থান এবং তার ক্রমাগত অভিযোজন সিদ্ধার্থর বারবার আমাদের এই প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয় — অস্তিত্ব ও বেঁচে থাকার মধ্যকার চিরন্তন টানাপোড়েন। পুঁজিবাদের সঙ্গে অস্তিত্বের লড়াইয়ে মানুষ সর্বদাই বিপর্যস্ত। তার দোসর হয়ে শক্তিকায়েমী রাজনীতির উত্থান — সবমিলিয়ে যেন চার্লি চ্যাপলিনের 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর' ছবিতে পৃথিবী নাচানোর এক অন্য সংস্করণ। কোথাও যেন পর্দার আড়ালে ভেসে ওঠে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সেই নাপাম মেয়েটির কথা, যে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ছুটে চলেছে দুর্দমনীয় অথচ

দিগভ্রান্ত হয়ে। এই দিগভ্রষ্ট হওয়াকেই যেন মনে করিয়ে দেয় সিদ্ধার্থর চাকরির ইন্টারভিউয়ের প্রশ্ন, ''Are you a communist ?'' খুব স্বাভাবিকভাবেই তীর ধেয়ে আসে নকশাল আন্দোলনের দিকে, যেখানে কমিউনিস্ট আদর্শ দিগভ্রষ্ট, উদভ্রান্ত। আর তার জেরেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বন্দুকের নল তাক করা থাকে বাম আদর্শের দিকে — বাম মনোভাব মানেই প্রতিষ্ঠান-বিরোধী, রাষ্ট্রের শত্রু; অতএব তাদের যতদিক থেকে পারা যায় প্রান্তিক করে ফেলার যাবতীয় প্রচেষ্টা করে যায় রাষ্ট্র ও তার অনুগত প্রতিষ্ঠান। সিদ্ধার্থর প্রাথমিকভাবে চাকরিতে সুযোগ না পাওয়া সেই প্রান্তিকতারই ফসল।

ছবির বেশিরবাগ অংশেরই দৃশ্যগ্রহণ কলকাতার অলিগলিতে — যা আঁকাবাঁকা, অনেক ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যবিহীন — অনেকটা সিদ্ধার্থর জীবনের মতো, যে জীবনের বিভিন্ন বাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে নিজেকে । এই দিগভ্রান্ত, উদ্দেশ্যবিহীন দশা ঘোচে না দিনের শেষ গন্তব্যেও। যেখানে বাড়ির ভিতরেও সিদ্ধার্থ এক প্রান্তিক অস্তিত্ব; তার পরিবার আর্থিক সংস্থানের জন্য তার দিকে তাকিয়ে থাকে না, নির্ভর করে থাকে তার বোনের উপর। অথচ, সিদ্ধার্থ তার সনাতন পুরুষালী মানসিকতায় এই পরিস্থিতি মেনে নিতে পারে না; তার অবচেতনে প্রায়শই হানা দেয় বীভৎস সব দৃশ্য — তার বোনের রোজগারের কতটা নৈতিক? আর কতটাই বা পতিতাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল ? সত্যজিৎ যেন সিদ্ধার্থর পারিবারিক সম্পর্কের এই জটিলতাকেই অলিগলির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন, অর্থাৎ পথের এই গোলকধাঁধাই যেন সিদ্ধার্থর পারিবারিক জীবনের Objective Correlative। তার বোনের 'নৈতিক অবক্ষয়' এবং ভাইয়ের নকশালপন্থী মানসিকতা — এসবের সঙ্গেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না । কোথাও যেন তার নিজের এই অস্তিত্বের লড়াই তাকে দুর্নীতিগ্রস্ত বস্তুবাদী সমাজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বাধ্য করে । কিন্তু তার বিবেক তার কাছে উত্তর চায়। সত্যজিৎ রায়ের জীবনীকার অ্যান্ড্রু রবিনসনের মন্তব্য এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ — ''He (Siddhartha) is Ray's archetypal man of conscience.'' অদ্ভুতভাবে, বৈপ্লবিক মতবাদকে সমর্থন করা সত্ত্বেও সিদ্ধার্থ নিজে বিপ্লবী হয়ে উঠতে পারে না। তার কারণ, রবিনসনের ভাষায়, ''(He is) too much the individual to submerge himself in politics, let alone revolution.'' সিদ্ধার্থর বন্ধুদের মতো নিজেকে সমাজব্যবস্থার হাতে সমর্পণ করা তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের বিপরীত। 'নেই রাজ্যের বাসিন্দে' হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধার্থ আশাবাদী। আর তাই হয়তো নিজের মেডিক্যালের বই বিক্রি করেও তার ভাইকে সে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা চে গুয়েভারার বই উপহার দেয়। অথচ, তার ভাইয়ের অভিযোগ, সেই বইয়ের মূল্য বোধহয় সিদ্ধার্থর জীবন থেকেই হারিয়ে গিয়েছে। নকশাল আন্দোলনের বীভৎসতা, মৃত্যুমিছিলকে সত্যজিৎ বারবার প্রতিষ্ঠা করেছেন চিতা, কঙ্কালের মতো দৃশ্য দিয়ে — যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে, ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়ে, খাদ্য আন্দোলনের সময়ে এবং যা আলাদা মাত্রা পেয়েছিল বাংলার 'হাংরিয়্যালিস্ট' আন্দোলনে। প্রতিষ্ঠান-বিরোধী বোহেমিয়ান মানসিকতার রূপক হিসাবে সত্যজিৎ তুলে ধরেছেন হিপিদের নেশাতুর জীবনযাত্রা, যা আবারও ১৯৬০-৭০ দশকের মার্কিন প্রতিসাংস্কৃতিক (Counter Cultural) অন্দোলনের আইকন অ্যালান গিনসবার্গের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এখানেও বেমানান সিদ্ধার্থ। সে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী, কিন্তু পারিবারিক দায়িত্বজ্ঞানের বোঝা তাকে বোহেমিয়ান হয়ে ওঠার বিলাসিতা দেয়নি। সে নতুন দিনের আলো খোঁজে, কিন্তু ছন্নছাড়া পরিস্থিতির জাঁতাকলে সে পর্যুদস্ত। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তর ভাষায়, ''ওদের জন্য কলেজে সিট নেই / অফিসে চাকরি নেই / কারখানায় কাজ নেই / ট্রামে-বাসে জায়গা নেই / মেলায়-খেলায় টিকিট নেই / হাসপাতালে বেড নেই / বাড়িতে ঘর নেই / খেলবার মাঠ নেই / অনুসরণ করবার নেতা নেই / প্রেরণা-জাগানো প্রেম নেই...।'' সিদ্ধার্থর জীবনে অবশ্য প্রেম আসে বন্ধুরূপে, কতকটা আকস্মিকভাবে। কেয়ার একাকীত্বের সঙ্গ সিদ্ধার্থর নিঃসঙ্গতাকে স্বতন্ত্র রূপ দেয়, আলোর ঠিকানা খোঁজার রসদ যোগায় । তার স্বাভাবিক নীরবতা যেন অস্বাভাবিক বিপ্লবী ভাবনায় সোচ্চার হয়ে বলে ওঠে, ''আমরা কি জানোয়ার ?'' যেন আবারও 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর' ছবির সেই বিখ্যাত বক্তৃতারই প্রতিধ্বনি, ''We are not cattle, we are men...'' 'হাইল, হিঙ্কেল' বলে চিৎকার না করে এক প্রচণ্ড আবেগ সিদ্ধার্থকে তাড়িত করে এই কপটাচারী, ভণ্ড, পুঁজিবাদী শক্তির মুখোশ টেনে

ছিঁড়ে দিতে, খানিকটা মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ' ছবির মতোই। যেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র রঞ্জিত কাঁচের মুখোশকে খানখান করে দিয়ে সাজানো পুতুলের গা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে ঔপনিবেশিক, ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের কপট আবরণ। এই সিদ্ধার্থ বা রঞ্জিতরা চিরকালই একা। কিন্তু তারা মূলস্রোতের রাজনৈতিক মতবাদে ভেসে যাওয়া কোনও চরিত্র নয়। তারা সাম্যবাদী মনোভাবাপন্ন হয়েও সাম্যবাদী হয়ে উঠতে পারে না। কারণ, তারা রাষ্ট্র নামক শোষণযন্ত্রের বশ হতে অপারগ। হাজারো কঙ্কালের ভীড়ে তারা মানুষ হয়ে নিজেদের ছাপ রেখে যায়; গড়ে দেয় এক আলাদা পরিচয় — তার নিজের জন্য, হয়তো বা তার মতো আরও অনেকের জন্য।

সিদ্ধার্থর এই আবেগতাড়িত আচরণ কি আদৌ শেষরক্ষা করতে পারে? আসলে শেষরক্ষা বোধহয় হওয়ার নয়। আর নয় বলেই আজও, ৫০ বছর পরেও, অপ্রতিদ্বন্দ্বিত থেকে যায় 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে ক্ষুধার্থ, অবহেলিত, নিপীড়িত, খেটে খাওয়া মানুষ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী অথবা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রতিনিয়ত লড়াই করছে বেঁচে থাকার জন্য, সেখানে জীবন যাপন বলতে আমরা যা বুঝি তা বোধহয় নয়। কারণ, এটা শুধু দু'বেলা অন্ন যোগানোর লড়াই, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। আশপাশের মানুষগুলো যেন নির্লিপ্ত, অবক্ষয়ের আওতার বাইরে। তারা অজ্ঞ বা স্বেচ্ছায় মুখ ফিরিয়ে রেখেছে নৈতিকতার গন্ডি থেকে। এটা যেন একটা প্রহসন — নীতিকথার মধ্যেই কোথাও যেন অনৈতিকতাই লুকিয়ে রয়েছে, তাকে লালন করছে সিদ্ধার্থর ইন্টারভিউ বোর্ডের মতোই কিছু আমলাতান্ত্রিক পরিচালক। এরা ক্ষমতালোভী, আত্মকেন্দ্রিক, দাম্ভিক, কিন্তু এরাই 'মানুষ'; এঁদেরই বাঁচার অধিকার আছে। এরা শুধু নিজেরাই বাঁচে না, সমাজের বাকি অংশের মানুষের বাঁচা-মরাও নির্ধারণ করে। সিদ্ধার্থকে একপ্রকার হার স্বীকার করেই বালুরঘাটে চাকরি নিয়ে চলে যেতে হয়। শহুরে আদবকায়দা থেকে দূরে অবস্থিত এই গ্রামাঞ্চল সিদ্ধার্থের স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়, যা আমরা ছবির শেষ দৃশ্যে দেখতে পাই। অর্থাৎ, গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই প্রেতচ্ছায়া গাছটি যেন ''শুকনো বৈরাগ্য বিদীর্ণ করে'' হাজার-হাজার সোনালি কচি পাতার জন্ম দিচ্ছে। এটাও বুঝি

> ''কঠোরের প্রচ্ছন্নে মাধুর্য্যের বিস্তীর্ণ আয়োজন
> প্রাণ আছে, প্রাণ আছে — শুধু প্রাণই আশ্চর্য সম্পদ
> এক ক্ষয়হীন আশা
> এক মৃত্যুহীন মর্যাদা।''

বিভাগের কথা

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষঃ (ফেব্রুয়ারি ২০২০ — জুন ২০২০)

২০২০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বক্তা ছিলেন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক শ্রী নলিনী বেরা। তিনি তাঁর রচিত বিভিন্ন সাহিত্য নিয়ে এক গভীর আলোচনা করেন। তাঁর প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভার মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। চর্চার মেয়েরা পরিবেশন করে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২৫ জুন, ২০২০ 'মহাভারতে ভাষা, ধর্ম ও রাজনীতি' শীর্ষক বিষয়ে বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন ড. শামিম আহমেদ। বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির। তাঁকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।

২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষঃ (জুলাই ২০২০ — জুন ২০২১)

২০২০ সালের অগষ্ট মাসে বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তর্জালিক মাধ্যমে একটি আন্তর্কলেজ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। বহু ছাত্র-ছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন আমাদের কলেজের বি. এড. বিভাগের বাংলার অধ্যাপক শ্রীমতি ভাস্বতী বোস। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে বিচার করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে নির্বাচন করেন । অধ্যাপক ভাস্বতী বোসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই প্রতিযোগিতার প্রথম তিনজন স্থানাধিকারীর লেখা পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো ২০২১ সালের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রইল আমাদের শুভকামনা।

২০২০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর অন্তর্জালে পালিত হয় ২২শে শ্রাবণ ঃ রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠান। বক্তব্য রাখেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক ড. অভ্র বসু। 'রবীন্দ্রনাথের পূজার গান' বিষয়ে তাঁর মননশীল বক্তব্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। তাঁর প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

২০২১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান পলিত হয়। এই বিশেষ দিনটিতে অন্তর্জালের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক গোপা দত্ত ভৌমিক 'মাতৃভাষা ও মানবাধিকার' বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত, তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য আমাদের ভাবনার জগৎকে বিস্তৃত করে দেয়। অধ্যাপক গোপা দত্ত ভৌমিককে কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম জানাই।

২০২১ সালের ২২ মে বাংলা বিভাগ আয়োজিত আন্তর্জালিক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. অর্পিতা ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল 'She is the other ঃ কবিতা সিংহ, নবনীতা দেবসেন এবং দেবারতি মিত্রর কবিতার অ্যালকেমি।' বাংলা কবিতা নিয়ে তাঁর এই আলোচনা আমাদের পরিচিত পাঠ অভ্যাসকে বিস্তৃত করে সন্দেহ নেই। অধ্যাপক ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।

২০২১ সালের ৩১ মে বিভাগীয় বিশেষ বক্তৃতায় 'লোককাহিনীর নানা দিগন্ত' শীর্ষক বিষয়ে আন্তর্জালিক মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন আশুতোষ কলেজের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত। লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির

একনিষ্ঠ পাঠক-গবেষক চন্দ্রমল্লীর এই আলোচনা সমৃদ্ধ করেছে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের। এছাড়া আমাদের বিভাগীয় পত্রিকায় অধ্যাপক চন্দ্রমল্লী ছড়ার কথা বিষয়ক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

২০২১ সালের ১৪ জুন বাংলা এবং সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জালিক মাধ্যমে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বিষয় ছিল 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে নারীর বিবর্তন'। কলেজের ফেসবুকের মাধ্যমে এটি প্রচারিত হয়। এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কলা অনুষদ (ডিন) ও ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক (ড.) সংযুক্তা দাশগুপ্ত এবং বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রী সুমন মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক দাশগুপ্তের বক্তব্যের বিষয় ছিল 'নৈশব্দ্য ভেঙে ঃ ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে নারীর বিবর্তন'। বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে তথ্যসমৃদ্ধ ও মনোজ্ঞ আলোচনায় তিনি বিষয়টিকে উপস্থাপন করেন । অধ্যাপক দাশগুপ্ত আমাদের শিক্ষক প্রতিম। তাঁকে আমাদের প্রণাম জানাই।

সহবক্তা শ্রী সুমন মুখোপাধ্যায় সমকালীন বাংলা সিনেমায় নারী চরিত্রের বিবর্তনের প্রসঙ্গটি তুলে ধরেন প্রধানত তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রের প্রেক্ষিতে। তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

এ প্রসঙ্গে কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের অধ্যাপক সুবীর চক্রবর্তী, মানসী সেনগুপ্ত এবং ময়ূখ লাহিড়ীকে ধন্যবাদ জানাই । দুই বিভাগের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া যে এমন একটি আন্তর্জালিক যৌথ আলোচনা সভা করা সম্ভব হত না সেকথা বলাই বাহুল্য।

২০২১ সালের ১৮ জুন কলেজের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'Impartus'-এর মাধ্যমে পালিত হয় 'অ্যাক্টিভ লার্নিং ডে' (শিক্ষা দিবস)। বিভাগীয় শিক্ষকদের উপস্থিতিতে ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করে। বিভাগের অনার্স, জেনারেল এবং এল.সি.সি.-র ছাত্রীরা এতে যোগদান করে। ছাত্রীদের পঠিত বিভিন্ন প্রবন্ধের বিষয়গুলি ছিল — 'রূপকথার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অনুষঙ্গে এর সমাজ বাস্তকতা', 'বাংলার লোকনৃত্য', 'পত্রকাব্য বীরাঙ্গনা', 'পাঠকের চোখে ব্যোমকেশ', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ উনিশ শতকের একক ব্যক্তিত্ব', 'উনিশ শতকের আধুনিক যুগের প্রথম কবি ঃ মধুসূদন দত্ত' এবং 'পুঁই মাচা - সমাজ চিত্রণের গল্প'। এই ধরণের উদ্যোগ ভবিষ্যতে তাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিশেষ সাহায্য করবে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিভাগীয় পত্রিকার জন্য আমরা বেশ কয়েকটি আমন্ত্রিত লেখা পেয়েছি। অধ্যাপক চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত 'ছড়ার কথা' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ দিয়েছেন। যোগমায়া দেবী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষ পূর্তিকে স্মরণে রেখে লিখেছেন 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' শীর্ষক একটি অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ মননশীল প্রবন্ধ। হরিমোহন ঘোষ কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. রুণা চট্টোপাধ্যায় 'শেষ অঘ্রান' শিরোনামে একটি কবিতা পাঠিয়েছেন। আমাদের কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শ্রীমতি দেবলীনা গুহঠাকুরতা সত্যজিতের একশো বছর পূর্তিকে স্মরণে রেখে লিখেছেন ''পঞ্চাশেও প্রাসঙ্গিক ঃ অপ্রতিদ্বন্দ্বিত প্রতিদ্বন্দ্বী।'' এঁদের সকলকে জানাই আমাদের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী বর্তমানের সহকর্মী দিশারী মুখার্জী 'প্রিয় কথক সদত হসন মান্টো' শীর্ষক একটি লেখা দিয়েছে, তাকে শুভকামনা জানাই। আমাদের প্রাক্তন ছাত্রীদের মধ্যে দেবলীনা দাশগুপ্ত ফেলুদাকে নিয়ে একটি লেখা পাঠিয়েছে। সুদীপ্তা সাহা এবং শ্রেয়সী দে-র কবিতা প্রকাশিত হল বিভাগীয় পত্রিকায় । তাদের সকলের জন্য রইল অনেক শুভকামনা।

বিভাগের এই সমস্ত অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ ড. অদিতি দে এবং কলেজ পরিচালন সমিতির সক্রিয় সহযোগিতায়। তাঁদের সকলকে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। অধ্যক্ষ ড. অদিতি দে প্রতিটি কাজে আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন। তাঁর প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।